Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া রহমান

রোলঃ 228021856

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া রহমান

রোলঃ 228021856

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া রহমান, আইডিঃ 228021856 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া রহমান

আইডিঃ 228021856

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

মুসলিম পরিবার 8

পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা 11

পশ্চিমা পরিবার 14

মুসলিম পরিবারে পুরুষের ভূমিকা 16

মুসলিম পরিবারে নারীর ভূমিকা 23

নারীর পর্দার বিধান 30

নারীকে ঘর থেকে বের করার প্রক্রিয়া 34

অসমান দেহ ও মনস্তত্ত্ব 37

মিডিয়া আগ্রাসন এবং উম্মাহ 42

বিকৃত মতবাদ 48

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে করণীয় 53

উপসংহার 57

ভূমিকা

بسم الله و الحمد لله، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ। আমার রিসার্চের বিষয় "পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর"।

মুসলিম সমাজের একক হলো পরিবার। পরিবার থেকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে পাড়া-মহল্লা; পড়া-মহল্লা থেকে সমাজে। এভাবেই ইসলাম ছড়িতে যায়। কিন্তু আফসোস ও পিরিতাপের বিষয় বর্তমানে মুসলিম পরিবারগুলো নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এমন এক পর্যায়ে আছে যা তাদেরকে সমূলে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ঠ। বর্তমানে প্রায় শতভাগ পরিবার নামে মাত্র মুসলিম পরিবার হিসেবে টিকে আছে।

মুসলিম পরিবারগুলোর দ্বীনহীনতার, এবং ক্রমাগত অবনতির মূল কারণ হলো ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ না করে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করা। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি দুটোর অবস্থান হলো দুই মেরুর অবস্থান। উভয়ের সহাবস্থান অসম্ভব। বর্তমানে মুসলিম পরিবারগুলো বিশ্বাস করে জাগতিক সফলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব শুধু পশ্চিমা সংস্কৃতির মাঝে। অর্থের প্রাচুর্য, সুউচ্চ দালান ইত্যাদি শান শওকতই এখন তাদের কাছে সফলতার নাম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন আল কারিমে ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সকলকে (তোমাদের কর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে। অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জান্নাতের বিপরীতে) পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।"[1]

[1] সূরা আলে ইমরান, ১৮৫।

অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশকারীই একমাত্র সফলকাম। আর জান্নাতে প্রবেশের জন্য চাই হিদায়াতের ওপর থাকা। অর্থাৎ সঠিক পথের ওপর থাকা। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ
اُولٰٓئِكَ عَلٰي هُدًي مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।"[2]

যারা ইমান আনে অদৃশ্যের ওপর এবং আসমানী কিতাবগুলোর ওপর, আখিরাতের ওপর এবং সালাত কায়েম করে, রিজিক থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে তারাই হিদায়াতের ওপর রয়েছে। আর তারাই সফকাম। অন্যথায় মানুষ হবে ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত। ফলত মানুষ যখন ইসলামের অনুসরণ না করে পশ্চিমা সভ্যতার অনুসরণ করা শুরু করেছে মানব জীবনে নেমে এসেছে ধ্বংস, অধঃপতন; সর্বপরি ব্যর্থতা।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। যাতে রয়েছে জীবনের প্রতিটি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম সমস্যা সমাধান। জন্ম থেকে মৃত্যু জীবনের ছোট বড় সকল পর্যায়ে আছে উত্তম বিধান। দিনের শুরু থেকে শেষ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছে উত্তম ব্যবস্থা। যা জীবনকে করে প্রশান্তিময়, সুন্দর, সহজ ও সাবলীল। তাই মুসলিমদের কাফিরদের অনুসরণের প্রয়োজন নেই। বরং এতে আছে মুসলিমদের অকল্যাণ।

মুসলিম পরিবারগুলোতে এখন আগা-গোড়া পশ্চিমাদের অনুকরণ যা শুধুমাত্র জীবনের অপচয়ই সাধন করে। বর্তমান মুসলিম সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন, পরিবারগুলোর ধ্বংস, বিচ্ছেদ, অশান্তির মূল কারণ আমরা পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থার দিকে তাকালে অনুধাবন করতে পারি।

[2] সূরা বাকারা, ৩-৫।

পশ্চিমা সভ্যতা বিগত দুইশ বছর যাবত আধুনিকতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার মনঃস্তত্ত্বের নামে নিজ সভ্যতার ধ্বংসের বীজ বুনেছে। যার ফল প্রকাশ্য দিবালোকে। আমাদের গবেষনার মূল উদ্দেশ্য আমাদের কওমের অস্তিত্ব রক্ষা করা। পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণে যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছে তার প্রতিকারের করণীয় অনুসন্ধান করা ও কওমকে সতর্ক করা।

আমরা চেষ্টা করেছি আদর্শ মুসলিম পারিবারিক কাঠামো তুলে ধরার। মুসলিম পরিবার গঠনে করণীয় তুলে ধরেছি। পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর সাথে মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর তুলনামূলক আলোচনা করেছি। পশ্চিমা সংস্কৃতির ভয়াবহতা তুলে ধরেছি। তুলে ধরেছি পশ্চিমা সভ্যতার ধ্বংসের আদ্যপ্রান্ত।

পরিশেষে মুসলিম কওমের অস্তিত্ব রক্ষায় করণীয় তুলে ধরেছি। উল্লেখ করেছি ধীরে ধীরে পশ্চিমা প্রভাবে মুসলিম পরিবারগুলোর মানসিক পরিবর্তন। এবং পরিবারে নারী-পুরুষ ভূমিকার আমূল পরিবর্তনের উপাখ্যান।

গবেষণা পত্রটির আরও একটি উদ্দেশ্য হলো দায়মুক্তি। হাশরে যেন আমাদের আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের সামনে জবাবদিহির মুখাপেক্ষী হতে না হয় যে আমরা উম্মাহকে রক্ষা করার চেষ্টাটুকুও করিনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের এই কাজকে বারাকাহপূর্ণ করুন। তার রহমাহ ও করুণা বর্ষণ করুন। দ্বীনের সামান্যতম খেদমত হিসেবে এই কাজটিকে কবুল করুন।
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমাদের প্রিয় মাদ্রাসা আইওএমকে যে এই কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আইওএমকে কবুল করুন এবং দ্বীনের খেদমতে কবুল করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন। নিশ্চয়ই সকল ভালো কিছু আমাদের মহামহিম রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। এবং যা কিছু মন্দ তা আমাদের নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ক্ষমা করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারকাতুহ

সাদিয়া রহমান

মুসলিম পরিবার

পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন। মুসলিম সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পরিবার। পরিবার থেকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ-রাষ্ট্রে ইসলাম ছড়িয়ে যায়। মুসলিম সমাজে পরিবার গঠনের একমাত্র পদ্ধতি হলো বিয়ে।

বিয়ে হলো একটি সামাজিক চুক্তি। যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে দুজন মানুষ একে অপরের সুখ দুঃখের অংশীদার হয় বৈধ পন্থায়। বিয়ে পরবর্তী সময়ে সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার গঠিত হয় মুসলিম পরিবারে।

বিয়েকে বর্তমান মুসলিম সমাজ সামাজিক বিধান হিসেবে ধারণ করলেও ইবাদত হিসেবে গণ্য করে না। অথচ এটাও সালাত, সাওম, হজ্জের মতো ইবাদত। যার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, বিবাহে সামাজিক চুক্তিবদ্ধতার দিকটি গৌণ এবং ইবাদতের দিকটিই প্রধান।[3]

বিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ

'বিবাহ আমার সুন্নাহ।'[4]

বিয়ের সুন্নাহ পদ্ধতি হলো, দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব, কবুল হবে এবং খুতবা প্রদান করবে। ইজাব হলো প্রস্তাব দেওয়া ও কবুল হলো প্রস্তাব গ্রহণ করা। খুতবা হলো বিয়ে সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক বক্তব্য এবং তিনটি সূরার আয়াত থেকে তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়েতে ইজাব কবুলের আগে খুতবা পড়তেন।

বিয়েতে সূরা নিসার **১** নং আয়াত, সূরা আলে ইমরানের **১০২** নং আয়াত, সূরা আহযাবের **৭০-৭১** নং আয়াত তিলাওয়াত করা হয় এবং এই আয়াতগুলোর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। সূরা নিসার **১** নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

---

[3] ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, পৃষ্ঠা: ২৬

[4] ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৮৩৬।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।[5]

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে সতর্ক করেছেন, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উসিলা দিয়ে একে অন্যের কাছে নিজেদের হক্ক চেয়ে থাকো সেই আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ একে অন্যের হক্কের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাক্বওয়া অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করতে বলেছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু (না আসে, বরং) এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।[6]

এই আয়াতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে ভয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি অবস্থায় একজন মুসলিমের মত জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বপরি তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা আহযাবের ৭০-৭১ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। আমি আমানত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শঙ্কিত হল আর তা বহন করে নিল মানুষ। বস্তুত সে ঘোর জালেম, ঘোর অজ্ঞ।

[5] সূরা নিসা : ০১

[6] সূরা আলে ইমরান: ১০২

এই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। j নাম বিয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিয়েকে করেছেন অধিকতর সহজ। দুজন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব কবুল এবং মাহর প্রদানের মাধ্যমেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। এমনকি খুতবা প্রধানও বিয়ের শর্ত নয় বরং সুন্নাহ।

কিছু কিছু ধর্ম এই প্রাকৃতিক চাহিদার বিষোদগার করেছে। সেসব ধর্ম এই চাহিদাকে শয়তানি চাহিদা হিসেবে গণ্য করে। এই চাহিদাকে নির্মূল করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে সেসব ধর্ম অনুযায়ী। যা থেকে বৈরাগ্যবাদ ও সন্যাসবাদের জন্ম। যা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম হলো ফিতরাতের ধর্ম। ফিতরাত যখন বৈধ পন্থায় নিবারণ করা যায় না তখন মানব মন তার জন্য অবৈধ পন্থার সন্ধান করে।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন,
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ
আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।[7]

অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তান, পরিবার ত্যাগ করে বৈরাগ্য গ্রহণ করলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। নবী-রাসূলগণেরও (আলাইহিমুস সালাম) স্ত্রী-সন্তান ছিল। তারা বৈরাগ্য বরণ করেননি। বরং স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা সহ সকলের হক্ব যথাযথভাবে আদায় করে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সম্পন্ন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন।

[7] সূরা রাদ, ৩৮।

পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা

মধ্যযুগীয় বর্বরতা, বহুল প্রচলিত এক পরিভাষা। এই মধ্যযুগ হলো ইউরোপীরের মধ্যযুগ। মধ্যপ্রাচ্য, স্পেন, উত্তর আফ্রিকাতে তখন ইসলামী খিলাফত, চলছে স্বর্ণযুগ। খৃষ্টধর্মে তখন 'তাওবাহ'র একটি ধারণা প্রচলিত। দোষ স্বীকার এবং বেশি বেশি ভালো কাজ, দান-খয়রাত করে শাস্তিকে কমিয়ে আনা। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতকের দিকে ধীরে ধীরে ''ভালো কাজ" ব্যাপারটা হয়ে গেল "কিনে নেওয়া"।

অর্থ ডোনেশনের মাধ্যমে কিনে নেওয়া হতো বেহেশতের সার্টিফিকেট। যাকে বলা হতো, "Indulgence Certificate"। মৃত পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষের নামে কিনে নেওয়া হতো এই বেহেশতি সার্টিফিকেট। ডোনেশনের অর্থগুলো চার্চ কর্তৃপক্ষ আর রাজ পরিবার ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতো।

তখন ডাইনি পুড়িয়ে মারার নামে হত্যা করা হতো লাখ লাখ নারীকে। ডাইনী নিধনের নামে ৫-৭ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত তিনশ বছরে। তখন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নাম সামন্ততন্ত্র। মধ্যযূগের সমাজ-কাঠামো ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। সোজা বাংলায় জমিদারি প্রথা। রাজা ট্যাক্স ও মিলিটারি সার্ভিসের বিনিময়ে জমিদারকে জমির মালিক করে দিতেন। আর খাজনা, ট্যাক্স, শ্রম দিতে বাধ্য করা হতো প্রজাদের। এই ব্যবস্থাকেই বলা হতো সামন্ততন্ত্র।

ইউরোপ এই সকল অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে ফুঁসে উঠল। ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে নির্মুল করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। একে বলা হয় ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তসমাজের অবসান ঘটল।

সূচনা হলো এক নতুন ইউরোপের। আলোকিত ইউরোপ, এনলাইটেনমেন্ট। পরিবর্তিত সমাজ কেমন হওয়া চাই তার রূপরেখা আঁকলেন ইউরোপের কয়েকজন দার্শনিক। তাদের চিন্তা দর্শন থেকে বেরিয়ে এলো পাঁচটি মূলনীতি। যা দিয়ে তৈরি হবে আধুনিক ইউরোপ, যেখানে ধর্মের (খৃষ্ট ধর্ম) দুঃশাসন আর ফিরে আসতে দেওয়া হবে না কোনোক্রমেই।
ধর্মের বিকল্প হিসেবে এগুলোকে চিরন্তন সত্য হিসেবে মেনে নিতে হবে। এগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়। মূলনীতিগুলোর প্রথমটি হলো আত্নকেন্দ্রীকতা (Individualism)।

আত্মকেন্দ্রিকতা বা শুধু আত্মতুষ্টি হলো অর্থনীতির মূল ভিত্তি। নিজেকে তুষ্ট করার সীমাহীন চাহিদা পূর্ণ করা। ব্যক্তির ইচ্ছা-সম্মতির ওপর গঠিত হবে আইন। যতক্ষণ আরেকজনের ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ সব বৈধ। ধর্মের নির্ধারিত মূল্যবোধ-নৈতিকতার মানদন্ড এখানে মূল্যহীন।

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা(Secularism)। বর্তমান বিশ্বে যার জয়জয়কার। মূলত তিনটি কথাকে ধর্মনিরপেক্ষতা হিসেবে ধরা হয়,

১. রাষ্ট্রীয় ও গণপরিমন্ডল থেকে ধর্মকে আলাদা করা।

২. আরেকজনের ক্ষতি না করে নিজের ধর্ম পালন করা, ধর্ম বদলানো বা বিশ্বাস না করা— যার বিবেক যা বলে সেটাই স্বাধীনতা।

৩. ধর্ম পালন করা বা বিশ্বাস না করার কারণে যেন কেউ সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ না করে; সবাই সমান।

অর্থাৎ ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিষয়। সমাজ-রাষ্ট্রে ধর্মের কোনো প্রতিফলন থাকবে না। যদিও খৃষ্টধর্মের দুঃশাসন চলেছে কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিয়োগ করা হয়েছে সকল ধর্মকেই। মধ্যযুগীয় বর্বরতা খৃষ্টধর্মের দ্বারা সংঘটিত হলেও এর দ্বারা ইসলামকেই বেশি আঘাত করা হয়। সর্বদা সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ইসলামকেই বিয়োগ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

তৃতীয় মূলনীতি হলো বস্তুবাদ। যার সংজ্ঞা হলো সকল কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ইহকাল, পরকালের কোনো অস্তিত্ব নেই। বিশ্বের সবকিছুই বস্তু বা শক্তি। রুহ বা আত্মা বলে কিছু নেই। আল্লাহ বা স্রষ্টা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

চতুর্থ মূলনীতি হলো ভোগবাদ। যা আত্মকেন্দ্রিকতা ও বস্তুবাদের মিশেল। এক জীবনে সর্বোচ্চ ভোগ করে আত্মতুষ্ট হওয়াই সফলতা। যা কিছু ইচ্ছে, নিজ মন যা বলে তাই করে উদযাপন করা। হোক তা নিজ স্বত্তার প্রতি কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর। ধর্মে বিধিনিষেধ থাকুক বা না থাকুক যা ইচ্ছে করার মানেই জীবনে সুখ-শান্তি উপভোগ করা।

পঞ্চম মূলনীতি হলো পুঁজিবাদ(Capitalism)। যা একটি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু। আগে যেখানে জমিদার প্রথা বা সামন্তবাদ

ছিল। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়। বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে সেটা দেশে-বিদেশে বিক্রি করে আরো যন্ত্র কিনে। আরও শ্রমিক লাগিয়ে আরও বেশি পণ্য উৎপাদন করে। এভাবেই চলতে থাকে। এ এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। সেখানে চলে মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা।

১৭৫৭ তে পলাসীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় হলো। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এর রাজস্ব আদায়ের ভার পেল ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি। উপনিবেশকৃত অঞ্চল থেকে লুটপাটকৃত অর্থে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হলো। নতুন নতুন মেশিনের আশীর্বাদে গড়ে উঠলো বৃহৎ বৃহৎ শিল্প। কুটির্র শিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেল ইউরোপে।

বৃহৎ শিল্পের জন্য চাই বৃহৎ পুঁজি। গড়ে উঠল ব্যাংক সেক্টর। সমাজের বিচ্ছিন্ন পুঁজিগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে চলে গেল কয়েকজন পুঁজিপতির কাছে। বৃহৎ শিল্পপতিরাই এখন নব্বই ভাগ সম্পদের মালিক। পুঁজিবাদ আরও বিকাশ লাভ করল। যত বেশি মুনাফা রাখা যায়, যত বেশি পুঁজি বাড়ানো যায়। এজন্য যা করা প্রয়োজন করা হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পাঁচটি মূলনীতিকে সমর্থন দেয় যেসব মতবাদ, সেগুলোর প্রচার করা হলো। সেগুলোর সমর্থন যোগানো হলো। ধ্রুবসত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হলো—বিজ্ঞানবাদ, ডারউইনিজম, নাস্তিক্যবাদ, নারীবাদ। এই পূর্ণ কাঠামোর নাম দেওয়া হলো মডার্নিটি বা আধুনিকতা।

এভাবেই বর্তমান আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের সূচনা।

পশ্চিমা পরিবার

পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা বর্তমানে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। নারীবাদের ব্যাপক বিস্তারের ফলে পরিবারগুলোতে নারী-পুরুষ উভয়ই উপার্জনের পেছনে ছোটে। আগে যেখানে পরিবারের নারীরা ঘরের দায়িত্ব ছিল এবং পুরুষরা বাইরের দায়িত্বে ছিল সেই ব্যবস্থা এখন পশ্চিমা সমাজে পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত। পশ্চিমা সমাজে ধর্মের কোনো উপস্থিতি নেই। পরকালের কোনো ভয় মানুষের মাঝে নেই। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কোনো ভয় নেই অন্যের হক্ক নষ্টের। অন্যের ক্ষতি যদি আইনের দৃষ্টিতে ক্ষতি হয় তবেই তা অপরাধ নয়তো তাতে কোনো বাঁধা নেই।

নারী-পুরুষ উভয়ে এখন ক্যারিয়ার, উচ্চ শিক্ষা, পদ-পদবিই যখন মর্যাদার নাম তখন নারীরা ছুটছে অর্থ উপার্জনের পেছনে। পুঁজিবাদীদের তৈরিকৃত কাঠামো অনুসারে অর্থ খেয়াল-খুশি মতো চলা হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। আর নারীর সাথে পুরুষের তাল মিলিয়ে নারী পুরুষ সমান হওয়াই নারী স্বাধীনতা। পুরুষরা পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া এবং নারীরা সন্তান লালন-পালন করা, পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া হলো পুরুষতন্ত্র।

উচ্চশিক্ষা অর্জন করা যদিও হোক তা পুরুষবান্ধব, পুরুষের মতো বাইরে কাজ করা, পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে উচ্চ পদ বাগিয়ে নেওয়া, অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হওয়াই হলো নারীর ক্ষমতায়ন, নারী স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদা অর্জন। মর্যাদার মাপকাঠি হলো অর্থ। উচ্চশিক্ষা-অধিকার-প্রগতি-স্বাধীনতা-ক্ষমতায়ন সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থ। নারীর ক্ষমতা হলো উপার্জন আর খরচের ক্ষমতা।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বাবলম্বী, উভয়ের নিজস্ব উপার্জন আছে। কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই। কারো কোনো পিছুটান নেই। তাই সংসার টিকিয়ে রাখারও কোনো পিছুটান নেই। তাক্বওয়াও নেই তাই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি হক্ক রক্ষারও ব্যাপার নেই। তাই সংসার ভাঙুক, বিয়ে ভাঙুক তাতে বাহ্যত কোনো সমস্যা নেই। ফল স্বরুপ পশ্চিমা সমাজে আজ ঘরে ঘরে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

Pew Research Center এর মতে ২০২৩ সালে প্রায় আঠারো লক্ষ আমেরিকানের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। এক তৃতীয়াংশ আমেরিকান যারা জীবনে কখনো বিয়ে করেছে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে।
পুঁজিবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া নারীবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন দর্শনের বলি হয়েছে পশ্চিমা পরিবার ব্যবস্থা। পশ্চিমা পরিবারগুলোতে মা-বাবা উভয়ে যখন অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরে তখন সন্তান এক বাড়তি ঝামেলার নাম।

এ তো গেল বিবাহিত পরিবারের কথা। পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা এখন আধুনিকতার নামে এতটাই নিম্ন পর্যায়ে আছে যে ওই সমাজে অবৈধভাবে একজন পুরুষ এবং নারী বিয়ে ছাড়াই সংসার করা খুব স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যাকে বলা হয় লিভ টুগেদার বা লিভ ইন রিলেশনশিপ। ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিক থেকে এই অবৈধ জীবনব্যবস্থার শুরু হয়েছে। শুরুতে এই ধরণের সম্পর্ক শুধু মিডিয়া জগতের অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছিল। যা এখন প্রতিটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই সম্পর্কের সুবিধা হলো এখানে কোনো দায়বদ্ধতা নেই, ইচ্ছে হলেই এই সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বিয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। যা এই লিভ ইন রিলেশনশিপে নেই। বর্তমানে হাজারো পরিবার আছে যেগুলো অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং সেই পরিবারে সন্তানও আছে। দু-তিন বাচ্চা নিয়ে বিয়ে করা এখন পশ্চিমা সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি এমন যুগলও আছে যারা একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ নয়, তারা একে অপরকে অনুমতি নেয় অন্য কারোর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে।

বিয়ের মতো আরেকটা বাড়তি ঝামেলা হলো সন্তান। সন্তান হলে সন্তান লালন-পালন করা, সারাক্ষণ তার পেছনেই নিয়োজিত থাকতে হয়। যা ক্যারিয়ারপন্থি একজন নারীর জন্য বিরাট বোঝা। উচ্চশিক্ষিত একজন নারীর জন্য চাকরি বা ব্যবসা না করে ঘরে বসে সন্তান লালন অনেক বড় বোঝা। তার ওপর অবৈধ সম্পর্কগুলোতে সন্তান নেই তো ঝামেলাও নেই। তাই সমাধান একটাই এই বাচ্চাকে ভ্রূণ অবস্থায়ই হত্যা করা। যত্রতত্র ব্যাভিচার করে বেড়াতেও আর কোনো বাঁধা রইলো না। তাই পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো গর্ভপাতকে বৈধ করেছে। বিয়ে করা ছাড়াই যেহেতু চাহিদা মেটানো যায় তাই বিয়ে করার হারও এখন কম। বিয়ে ব্যতিত সম্পর্কগুলো যখন ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে ভেঙে উভয়ে আলাদা হয়ে যায়। পরিবার গঠিত না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো সমকামিতার প্রসার এভাবেই পশ্চিমা দেশগুলোতে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

মুসলিম পরিবারে পুরুষের ভূমিকা

মুসলিম পরিবারে আমীর হলেন স্বামী। একক পরিবার[8] হলে আমীর হন স্বামী, বর্ধিত পরিবার[9] হলে আমীর হন বাবা। পরিবারে সবার অভিভাবকত্ব এবং নেতৃত্বের স্থানে থাকেন স্বামী। হালালভাবে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের সকলের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদার যোগানদাতা দেন স্বামী।

পুরুষের দায়িত্ব বাইরে এবং নারীর দায়িত্ব ঘরে। পুরুষ সদস্যরা উপার্জনের করে খোরপোষ যোগান দেয়। পরিবারে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বাকি সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়

আল কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান। এখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বিধান নাজিল করেছেন। আল কুরআনে আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ওয়াল জালাল অসংখ্য আয়াতে নারীদের জন্য পুরুষদের করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পুরুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছেন। আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।।[10]

পুরুষকে নারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলিম নারীর সর্বাবস্থায় সকল দায়িত্ব তার মাহরাম পুরুষের।

সূরা নিসার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

---

[8] যে পরিবার শুধু বাবা-মা এবং সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়।

[9] যে পরিবারে দাদা-দাদি, বাবা-মা, চাচা-চাচি, ফুফু এবং সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়।

[10] সূরা নিসা, ৩৪।

হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[11]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং অন্তরে যেন তাঁরই ভয় রাখে। অতঃপর তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন-আল্লাহ তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং ঐ ব্যক্তি হতেই তিনি হযরত হাওয়া (আঃ)-কেও সৃষ্টি করেছেন।অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন- 'দু'জন হতে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করতঃ দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকারে, বিশেষণে, রঙ্গে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। এ সমস্ত যেমন পূর্বে আল্লাহ তাআলারই অধিকারে ছিল, তিনি তাদেরকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নেবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তার আনুগত্য ও ইবাদত করতে থাক। [12]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা নিসা শুরু করেছেন মানবজাতির উৎস হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়ে। যেন প্রচ্ছন্নভাবে আল্লাহ বলছেন যার যিনি তোমাকে বহন করেছে তার সম্মান করো। এরপর আল্লাহ সতর্ক করছেন, যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে হক্ব চেয়ে থাকো তাকে ভয় কর এবং অন্যের হক্ব যথাযথ পূরণ কর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা বাকারায় উল্লেখ করেন,
وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন বার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতীক্ষায় রাখবে। আর তারা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তবে আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে

[11] সূরা নিসা, ০১।
[12] তাফসীরে ইবনে কাসীর এর সূরা নিসার ১ নং আয়াতের ব্যাখা থেকে।

যা-কিছু (ভ্রূণ বা হায়য) সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না। তাদের স্বামীগণ যদি পরিস্থিতি ভালো করতে চায়, তবে এ মেয়াদের মধ্যে তাদেরকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ওয়াপস গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।[13]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদের প্রতি নির্দেশ করেছেন, যদি তালাক হয়ে যায়, তবে ৩ বার হায়েজের জন্য অপেক্ষা করবে। যদি আল্লাহ তাদের গর্ভে স্বামীর সন্তান দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের উচিত নয় তা গোপন করা। কেননা যদি স্ত্রী দিতীয় বিয়ে করেন তাহলে সম্ভাবনা আছে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার। হতে পারে সন্তান প্রথম স্বামীর। এই বিধান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হিকমাহর অন্য নিদর্শন। এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ-নির্দেশই তার বান্দার জন্য কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয়।

এরপর যদি তাদের মাঝে বনিবনা হয়ে স্বামীর জন্য আল্লাহ এই সুযোগ রেখেছেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার। অথবা এই সময়ে যদি তারা উভয়ে ভিন্ন মানুষকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাদের জন্য সেই পথও খোলা রইল। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পুরুষদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার আছে ঠিক তেমনি নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার আছে স্বামীর ওপর। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু পুরুষকে সতর্ক করছেন যে! "আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।" অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উভয়ের ওপরই পরাক্রমশালী। এই বাড়তি একস্তর মর্যাদা অধিকারের নয় বরং সতর্কতার। যেহেতু স্ত্রীদের আল্লাহ জোর খাটিয়ে শক্তিমত্তা দেখিয়ে অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা দেননি তাই আদায়ের দায়িত্ব পুরুষেরই জিম্মায়। পুরুষ তো নিজের অধিকার নিজ ক্ষমতা ও আল্লাহ প্রদত্ত্ব মর্যাদার বলেই নারীর কাছ থেকে আদায় করে নেয়।

কিন্তু নারীর অধিকারও তো আদায় করা প্রয়োজন, কেননা তারা তো শারীরিক শক্তিমত্তা দেখিয়ে জোর খাটাতে পারে না। এ যেন যার দ্বারা নিয়ম ভাঙার সম্ভাবনা, তাকেই দায়িত্বশীল করে দেওয়া। ক্লাসে টিচাররা সবচেয়ে দুষ্টু স্টুডেন্টকে ক্লাস-ক্যাপ্টেন বানিয়ে দেন। অথবা দেখা যায় যে স্টুডেন্ট ক্লাসে বেশি কথা বলে তাকেই অন্যদের মাঝে কে কথা বলে তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেন এতে সে নিজের শান্ত হয়ে যায়। পুরুষকে আল্লাহ এভাবেই

[13] সূরা বাকারা, ২২৮।

একস্তর মর্যাদা স্মরণ করিয়ে স্যাক্রিফাইস নিলেন। আর পুরুষকে দিয়েই দুর্বল নারীদের অধিকার নিশ্চিত করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের এমনই ব্যাখা করেছেন।

পরিবারে পুরুষের কর্মপন্থা

পুরুষের কাজ বাইরে এবং নারীর কাজ ঘরে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পুরুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে বাইরের পরিবেশ পুরুষের জন্য উপযোগী এবং ঘরের পরিবেশ নারীর জন্য। উপার্জন করা, বাজার করা, সন্তানদের স্কুল-মাদ্রাসায় আনা-নেওয়া, যেকোনো পুরুষের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি বাইরের সকল দায়িত্ব পুরুষের।

একজন পুরুষের বিয়ের উপযুক্ততার জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো— দ্বীনদারিতা থাকা, উপার্জনক্ষম হওয়া, স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়ার যোগ্যতা থাকা, বংশমর্যাদা থাকা, স্ত্রীর পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করা ইত্যাদি। পরিবারের অন্য পুরুষদের সাথে স্ত্রীর পর্দা রক্ষার ব্যবস্থা করা একজন পুরুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

পরিবারের সদস্যদের যেকোনো প্রয়োজনে খেয়াল রাখা, কারো কোনো হক্ক নষ্ট হচ্ছে কীনা, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা ইত্যাদি একজন পুরুষের সাধারণ দায়িত্ব। সন্তানদের স্কুল-মাদ্রাসায় ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব পিতার। ঘর থেকে বের হলেই বিভিন্ন পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় যেমন: রিকশাওয়ালা, দোকানদার, মাছ- সবজি বিক্রেতা, ফার্মেসীর ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি এদের সাথে কথা বলার দায়িত্ব পরিবারের পুরুষ সদস্যের। এছাড়া ঘরেও অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস মেরামতের প্রয়োজনে মিস্ত্রী ডাকার প্রয়োজন পড়ে। তাদের সাথেও কথা বলে কাজ সম্পন্ন করবেন পরিবারের পুরুষ সদস্য।

একজন গায়রতবান মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয় তার পরিবারের নারী সদস্যেদের হাটে-বাজারে পাঠানো। গায়রতবান পুরুষ কখনো এমনটা কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণে অধিকাংশ মুসলিম পুরুষরা হয়েছেন বে-গায়রত আর নারীরা হয়েছে বে-হায়া।

বর্তমানে মুসলিম পরিবারগুলোতেও নারীরা হাটে-বাজারে যান। কুলিওয়ালা-ঠেলাওয়ালা যে কারোর সাথে বিনা প্রয়োজনেও কথা বলেন। এবং এতে পুরুষরা কিছুই মনে করেন না একে। কোনো সমস্যাই মনে করেন না। অতি প্রয়োজন ব্যতিত পুরুষদের উচিত নয়

কোনোভাবেই আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে পরিবারের নারী সদস্যদের বাইরে চাকরি করতে পাঠানো, বাজার সদাই করতে পাটানো, সন্তানকে স্কুলে আনা-নেওয়া করানো।

ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)[14]

দাইয়্যুস পুরুষের দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফিরেও তাকাবেন না। মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের পর্দার রক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের সর্বোচ্চ সতরেক থাকতে হবে। পরিবারের নারী সদস্যদের পর্দা রক্ষার বিষয়ে সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকা পুরুষদের দায়িত্ব।

রাসূলুয়াহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানাত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হাক্ব (হক) রয়েছে। [15]

অতএব নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করা। কেননা স্ত্রীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বামীদের প্রতি আমানত স্বরুপ। যদি তারা আল্লাহর নাফরমানী করে অথবা প্রতারণা করে স্বামীর হক্ব নষ্ট করে তবে তার বিছানা আলাদা করতে বলা হয়েছে। তাতেও সে সতর্ক না হলে তাকে মৃদু প্রহার করা যাবে।

আর এই প্রহারের স্বরুপ হলো—

- চেহারায় মারা যাবে না।[16]
- গালিগালাজ করা যাবে না।[17]

---

[14] (আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈ ২৫৬২, সহীহুল জামে, ৩০৭১)
[15] সহীহ মুসলিম, ২৮৪০।
[16] মুসলিম ১২১৮, আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৪/১০। সুনানে ইবনে মাজাহ ১৮৫০।
[17] বুখারি, ২৪৫৯।

- আঘাতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে না, দাগ হবে না। ফুলবে না, ব্যাথা হবে না; লালও হবে না।[18]

অর্থাৎ এই প্রহার হলো নামে মাত্র প্রহার। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, তাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের। পুরুষদের উচিত সর্বদা নারীদের হক্কের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

আবার প্রহার করাকে নিরুৎসাহিত করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদের প্রহার কোরো না। যারা এমনটা করে তাদের তোমরা ভালো লোক হিসেবে পাবে না।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ فَضُرِبْنَ فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ

আবদুল্লাহ বিন আবু যুবাব (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদের প্রহার করো না। অতঃপর উমার (রাঃ) নবী (রাঃ) -এর কাছে এসে বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যাচরণ করছে। তাই তাদেরকে মারার অনুমতি দিলেন এবং তারা প্রহিত হলো। পরে অনেক নারী রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বাড়িতে সমবেত হলো। সকাল বেলা তিনি বলেনঃ আজ রাতে মুহাম্মদের পরিবারের সত্তুরজন মহিলা এসে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তোমরা মারপিটকারীদেরকে তোমাদের মধ্যে উত্তম হিসাবে পাবে না।[19]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের মুখমন্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

মুআবিয়াহ (বিন হায়দার) (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, সে আহার

[18] আল মাওআসিতুল ফিকহিয়্যা ২৪/১০।
[19] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৯৮৫।

করলে তাকেও (একই মানের) আহার করাবে, সে পরিধান করলে তাকেও একই মানের পোষাক পরিধান করাবে (অথবা তোমাদের ভরণপোষণের সাথে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করার সাথে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ও ব্যবস্থা করবে)। কখন ও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না।[20]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তার কোনো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেননি। এমনকি কখনো কোনো খাদেমকেও কখনো মারপিট করেননি। অন্য কাউকেও কখনো প্রহার করে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি।[21]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।[22]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।[23]

সর্বোপরি একজন মুসলিম পুরুষ সর্বদা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সদ্যবহার করবে। তাদের হক্ব আদায় করবে। পরিবারকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষার চেষ্টা করবে। পুরুষদের উচিত নয় পশ্চিমাদের মতো ঘরের নারীদের বাইরে কাজ করতে পাঠানো, নিজের দায়িত্ব পালন না করে নারীর ওপর সংসারের ভার চাপিয়ে দেওয়া। দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ ও শান্তি পেতে চাইলে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন থাকা।

[20] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮৫০।
[21] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৯৮৪।
[22] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৯৭৭।
[23] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৯৭৮।

মুসলিম পরিবারে নারীর ভূমিকা

মুসলিম পরিবারে সকল কিছুর ব্যবস্থাপক হলেন নারী। পরিবারে পুরুষদের দায়িত্ব বাইরে আর নারীর দায়িত্ব ঘরে। দুনিয়ার আর কোনো মানুষের প্রতি নারীর কোনো দায়িত্ব নেই। সকল দায়িত্ব ও ভার থেকে সে মুক্ত। তার কাজ কেবল, স্বামীর আনুগত্য এবং সন্তানের পরিচর্যা করা।

সন্তানকে দ্বীনি তারবিয়াত দেওয়া, মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা একজন মুসলিম মায়ের দায়িত্ব। সন্তানকে জন্ম লগ্ন থেকে একজন মুসলিম মা চেষ্টা করেন আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখবেন। তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় মুসলিম না নিশ্চিত করেন সেই প্রতিষ্ঠান যেন দ্বীনি তারবিয়াত দেন। মা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন সন্তানকে সাধারণ মানুষ নয় বরং উম্মাহর সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো নারী নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাদানে রোজা রাখে, নিজেকে পবিত্র রাখে, স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।[24]
নারীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ এতটাই সহজ যে, সালাত আদায়, রোজা রাখা, নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র রাখা এবং স্বামীর আনুগত্য করাই তার জন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়। কিন্তু অধিকাংশ নারী এই সহজ কাজগুলো করতেও অক্ষম।
জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী।
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ ". قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, ‘তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?’ তিনি বললেনঃ ‘তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।’ তুমি যদি দীর্ঘদিন

[24] সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪১৬৩

তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষনো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।'[25]

পশ্চিমা সমাজে নারীরা স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর তাই তারা স্বামীর আনুগত্য করার প্রয়োজন মনে করে না। স্বামীর অবাধ্যতাকে তারা সাহসের প্রতীক ভাবে। সামান্য ত্রুটিতেই তারা স্বামীর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে উদ্দত হয়। শেষ জামানার মুসলিম নারীরও পশ্চিমা নারীদের অনুকরণে স্বামীর আনুগত্য করে না। স্বামীর মূল্যায়ন করে না।

পশ্চিমাদের অনুকরণে ঘরের বাইরে বেপর্দা ঘুরে বেড়ায়। পুরুষদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, একমাত্র স্বামী ব্যতীত যেকোনো পুরুষ হতে পারে। তাদের সবচেয়ে প্রচলিত বুলি হলো," কামাই থাকলে জামাই লাগে না"। অর্থ উপার্জন, বেপর্দা পোশাক পরাই তাদের কাছে নারী স্বাধীনতা এবং সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

যদিও সম-অধিকার বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। পুরুষ এবং নারীর শারীরিক এবং মানসিক গঠনে অনেক পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের আবেগ অনূভুতি কোনো কিছুই এক নয়। পুরুষদের জন্য যেই কাজ পানির মতো সহজ সেই একই কাজই নারীর জন্য প্রচন্ড কঠিন হতে পারে। আবার নারীর জন্য যা সহজ পুরুষের জন্য তা কঠিন হতে পারে। নারীর নারী হিসেবে সম্মানিত। নারীকে পুরুষের সাথে তুলনা করে নারীসত্তাকেই অবমূল্যায়ন করা হয়। নারী পুরুষ পরস্পর সম্পূরক। একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ।
পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা(স্ত্রী) তোমাদের জন্য পোষাক এবং তোমরাও(স্বামী) তাদের জন্য পোষাক।[26]
অর্থাৎ পোষাক যেমন মানুষকে ঢেকে রাখে ঠিক তেমন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোষাকের মতো অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে অপরকে ঢেকে রাখে। একে অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে। একে অপরের চাহিদা নিবারণ করে। একে অপরের সুখ দুঃখগুলো কাছ থেকে অনুভব করে।

বর্তমানে নারীবাদীরা স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ককেও ধর্ষণ বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছে। পশ্চিমা ধ্বংস প্রাপ্ত সমাজের অনুকরণে বাংলাদেশেও নারী কমিশনের নামে এই ধরণের অযৌক্তিক দাবি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী

[25] সহীহ বুখারী: ২৯, মুসলিম ৮/১ হাঃ ৮৮৪, আহমাদ ৩০৬৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৮,ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৮)
[26] সূরা বাকারা, ১৮৭।

স্বামীকে বৈধতা দেয় যে তারা একে অপরের চাহিদা নিবারণ করতে সম্মত। এর বাইরে প্রতিনিয়ত সম্মতি দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

আবার তারা হালাল স্বামীর চাহিদা পূরণকে বৈবাহিক ধর্ষণ বললেও, হারামভাবে ব্যাভিচার করাকে সমস্যা মনে করে না যদি নারী পুরুষ উভয়ের সম্মতি থাকে। এসব যেন স্বাধীনতার নামে প্রহসন। এই সকল অযৌক্তিক, অন্যায় কাজ করে নারীরা শুধু নিজেদের জন্য অভিশাপই কুড়িয়ে নেয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তাহলে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর লা’নত বর্ষণ করতে থাকে।[27]

যদি কোনো নারী শয্যা ত্যাগ করে স্বামীকে কষ্ট দেয় যতক্ষণ সে ফিরে না আসে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ দিতে থাকেন। নারীদের উচিত নয় কখনো তার স্বামীকে কষ্ট দেওয়া।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِينِ لَا تُنْذِيْهِ . قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ
يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কাউকে তার স্ত্রী দুনিয়ায় কষ্ট দান করে, তখন তার হুর স্ত্রী বলে, তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার কাছে কয়েক দিনের অতিথি। শ্রীঘ্রই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে আসবে'।[28]

স্ত্রী যখন স্বামীকে কষ্ট দেয় কথার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে তখন স্বামী যদি তাক্বওয়াবান সচ্চরিত্রবান হয় তাহলে জান্নাতের আয়তলোচনা হূররা সেই স্ত্রীকে অভিশাপ। জান্নাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একজন তাক্বওয়াবান, মু’মিন, মুহিসীনিন, মুজাহিদ পুরুষের জন্য ৭২ জন ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর রেখেছেন তার স্ত্রী হিসেবে। যার জান্নাতে তার জন্য অপেক্ষমান।

---

[27] সহীহ বুখারী: ৫১৯৪, (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮১৫)
[28] (তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৯৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১০৮৫)

অথচ স্বামী সন্তুষ্ট হলেই একজন নারীর জন্য জান্নাতে যাওয়া খুবই সহজ।

وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا إِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

'হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী এ অবস্থায় মারা যাবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[29]

স্ত্রী যদি স্বামীকে রাজার মতো মর্যাদা দেয় তবে স্ত্রী হবে রাণী। আর স্ত্রী যদি স্বামীর দাসী হয় তাহলে স্বামীও তার জন্য হয় দাস। আনুগত্যে করার মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর সম্মান করার মাধ্যমে স্ত্রীর সম্মানই বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু পশ্চিমা নারীদের অণুকরণে মুসলিম নারীরা স্বামীর অবাধ্যতা করে, বেপর্দা ঘুরে বেড়ায়, গীবত-চোগলখোরী করে, একে অন্যের ক্ষতি করে। যা নারীদের জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। তাই নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়া এতটা সহজ হওয়া সত্ত্বেও নারীরা জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী।

নারীরা যদি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করে, সালাত-সিয়াম পালন করে, সাধ্যমতো সাদাকাহ করে, স্বামীর আনুগত্য করে, পর্দা রক্ষা করে, নিজের চরিত্র হেফাজত করে, সাধ্যমতো হজ্জ্ব-উমরাহ করে তাহলে কার সাধ্য নারীদের জান্নাত থেকে দূরে রাখে। একজন মুসলিম নারীর আদর্শ হওয়া উচিত আল্লাহ রাসূল ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণ। যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মু'মিনদের মা উপাধী দিয়েছেন।

বর্তমানে নারীরা অল্পে তুষ্ট থাকেন না, বিলাসিতায় অভ্যস্ত জীবনযাপন করেন। সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন তাদের চাহিদা যেন বাড়তেই থাকে। স্বামীরা তাদের চাহিদা মোতাবেক উপার্জন করতে গিয়ে হিমসিম খান। বাধ্য হয়ে অনেকে হারাম উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। একজন মু'মিন মুসলিম নারীর সাথে এটা কখনোই মানায় না যে সে এতটা দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে যাবে। অথচ উম্মাহাতুল মু'মীনিনদের ঘরে মাসের পর মাস চুলা জ্বলেনি। তারা না কখনো দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন, রোজা রেখেছেন। কখনো শুধু পানি আর খেঁজুর খেয়েই আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করেছেন। সবরের পর সবর করেছেন। তাই তো তারা উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মর্যাদা লাভ করেছেন।

কথায় আছে, নারীরাই নারীদের শত্রু। বাস্তবতা এর চেয়েও করুণ। বর্তমানে মুসলিম নারীরা অমুসলিমদের ন্যায় একে অপরের শত্রুতা করে। অন্তরে গভীর হিংসা বিদ্বেষ লালন করে।

[29] তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮১; ইবন মাজাহ:, হাদীছ নং ১৮৪৪

গীবত-তোহমতের মাধ্যমে সর্বদা একে অপরের পেছনে লেগে থাকে। আল্লাহকে ভয় করেন না। অথচ কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।

গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ। গীবত-তোহমতে আজ মুসলিম পরিবারগুলো জর্জরিত। গীবতের জন্য এতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় যে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ পর্যন্তও গড়ায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অধিক অনুমান করা থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুমান থেকেই অধিকাংশ সময় মানুষ একে অপরকে অপবাদ দেয়। এই সকল কাজ থেকে মুসলিমদের বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে। একজন আদর্শ মুসলিম নারীকে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, আল্লাহকে ভয় করতে হবে। নিজ জীবন ও পারিবারিক জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দ্বীনদার, তাকওয়াবান হলেই সংসার বারাকাহ পূর্ণ হয়।

পিতা মাতার হক্ব

দুনিয়ার জীবনে পিতা-মাতা হলেন এমন দু'সত্তা যারা জীবনভর নিঃস্বার্থ সন্তানের লালন-পালন করে যান। নিঃশর্তে সন্তানকে ভালোবেসে যেন। দুনিয়ায় এই দুজনব্যতিত এমন কোনো মানুষ নেই যারা একদম নিঃস্বার্থ কারো ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে। একমাত্র মা-বাবাই ভরণপোষণের দায়িত্ব পালব করেন বিনা-বাক্য ব্যায়ে। মা-বাবা সন্তানের জন্য যতটা ত্যাগ স্বীকার করে তার একশভাগের এক ভাগও সন্তানের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়।

সন্তানকে গর্ভে ধারণ, জন্মের পর সর্বক্ষণ লালন পালন করা, যত্ন করা থেকে নিয়ে বড় হওয়ার পর সার্বক্ষণিক দেখভাল করা, পড়াশোনা করানো, উত্তম তারবিয়াহ দেওয়া, ভালো

মন্দের খেয়াল রাখা, অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলা সবকিছুই বাবা-মা'রা আনন্দের সহিত করে যান। কিন্তু সন্তান সেই বাবা-মাকে বড় হয়ে কদর করে না। সেই বাবা-মায়ের দেখাশোনায় ভাই-বোনদের একে অপরের সাথে রেষারেষিতে লিপ্ত হয়। একে অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে দিতে থাকে। নিজের কর্তব্য ভুলে অন্যকে দোষারোপ করে। মা-বাবা দু'জন তো আটদশটা সন্তানকে দুই দুই চারহাতে বড় করে তোলেন কিন্তু সেই আট দশজন ছেলে মেয়ে মিলে দু'জন মা-বাবার যত্ন করতে পারেন না, অপারগতা প্রকাশ করেন। ভুলে যান আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.

জান্নাত মায়ের দু'পায়ের নিচে।[30]

সন্তানরা বড় হওয়ার সাথে সাথে মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করা শুরু করে। মা-বাবাকে যথাযথ সম্মান করে না। মা-বাবার আদেশ অমান্য করে। মা-বাবাকে হেয় করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَقَضٰي رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا. لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۭ

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।[31]

আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ওয়াল জালাল পবিত্র কুরআনে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করতে, মা-বাবা বৃদ্ধ হলে তাদেরকে উফ পর্যন্ত না বলতে তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বলতে। তাদের প্রতি মায়া-মুহাব্বাতের সাথে আচরণ করতে। তাদের সামনে বিনয়াবনত থাকতে। এবং আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন মা-বাবার জন্য দুয়া করতে। মানুষ যখন মা-বাবার অবাধ্যতা করে, মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে তখন তারা আল্লাহর অবাধ্যতাও করে।

মায়েদের আছে বাবাদের চেয়ে বেশি ভালো ব্যবহার পাওয়ার হক্ব। কেননা সন্তান জন্ম দানের অতুলনীয় কষ্ট মাকে সহ্য করতে হয়। জন্মের পর মাকেই রাতের পর রাত নির্ঘুম

---

[30] সুনানে আন নাসায়ী, ৪১০৪।

[31] সূরা বনি ইসরাইল, ২৩-২৪।

রাত কাটিয়ে সন্তানের দেখভাল করতে হয়। দু'বছর পর্যন্ত মাকে দুধ পান করাতে হয়। সেই কষ্টদায়ক সময় পার করে বড় হওয়ার সাথে সাথে মায়েদের কষ্টও ভিন্ন রূপ নিতে থাকে। সন্তানকে খাবার নিজ হাতে খাবার খাওয়ানো, পটি করানো শেখানো। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া, দ্বীনি তারবিয়াহ দেওয়া ইত্যাদি। এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো। শুধু মাত্র একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর জন্য মা-বাবাদের কত শ্রম দিতে হয় তা যদি সন্তানরা জানতো! এরপর বড় হওয়ার সাথে সাথে মা-বাবাদের সন্তানের প্রতি যে অবদান তার একমাত্র সাক্ষী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই।

সন্তানদের উচিত সবসময় মা-বাবার হক্ক এর ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। পশ্চিমা বিশ্বে ১৮ বছরের পর থেকে সন্তান আর মা-বাবার অধীন নয়। মা-বাবার কথা মান্য করতে তারা বাধ্য নয়। মা-বাবা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। কারণ পশ্চিমা আইন অনুসারে ১৮ বছর থেকে সন্তানরা প্রাপ্ত বয়স্ক। পশ্চিমা সমাজে ছেলে-মেয়েরা বয়স হলে মা-বার দেখভাল করে না। ১৮ এর পর থেকেই মা-বাবা থেকে অধিকাংশ সন্তান মা-বাবা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

অধিকাংশ মা-বাবাকে শেষ বয়সে ওল্ড হোমে অথবা নিজ ঘরে একাকিত্ব কাটাতে হয়। এছাড়া বর্তমানে ১৮ এর চেয়ে কম বয়সেও সন্তানদের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যান মা-বাবারা। পশ্চিমা দেশগুলোতে এলজিবিটিকিউসহ বিভিন্ন বিকৃত মতবাদ স্কুলের শিশুদের শেখানো হয়, এমনকি সন্তান জন্মদানের মতো স্পর্শকাতর ভিডিও দেখানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। মা-বাবারা এই সকল বিষয়ে প্রতিবাদ করলেই সরকার মা-বাবা থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয়। সরকারী সেইফ হোমে সন্তানকে স্থানান্তর করে। টিনএইজের বাচ্চাদের মা-বাবা শাসন করলে বাচ্চারাদের সেইফ হোমে হস্তান্তর করে সরকার। বাচ্চাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে মা-বাবার ব্যাপারে সরকারকে অভিযোগ করা। সেইফ হোমে নেওয়ার পর মা-বাবার জন্য সন্তানের সাথে যোগাযোগ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে মা-বাবাদের সন্তানকে রক্ষা করা উচিত। দ্বীনি তারবিয়াহ দেওয়া উচিত। নিজ পিতা-মাতার সেবা করা উচিত। ছোট থেকেই মা-বাবার হক্ক সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাহলেই একমাত্র আশা করা যায় সন্তান মা-বাবার হক্কের ব্যাওয়ারে সচেষ্ট হবে।

নারীর পর্দার বিধান

ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টি তাই আল্লাহই ভালো জানেন আমাদের জন্য কি কল্যাণকর আর কি অকল্যাণকর। যার অনেক কিছু মানব মস্তিষ্কের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কারণ মানব মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতা আছে।

ইসলাম মানুষের জন্য যা কল্যানকর তা হালাল করেছে এবং যা অকল্যাণকর তা করেছে হারাম। নারী বেপর্দা হয়ে শুধু মাত্র নিজের ক্ষতিই করে না, করে নিজেকে ফাসেক পুরুষদের চোখের খোরাকও। নিজেকে পবিত্র রাখলে সে শুধু নিজেকেই বাঁচায় না বরং বাঁচায় আরও অগণিত নারীকে।

ফাসেক পুরুষরা যখন নারীদের চোখ দিয়ে গিলে খায় তখন তারা অন্তরে সেই নারীকে ধর্ষণ করার সুপ্ত ইচ্ছে লালন করে। সুযোগের অভাবে তারা তা করতে পারে না। কিন্তু যখনই তারা কোনো নারীকে দুর্বল অবস্থায় বাগে পায় তখনই তারা তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। যেকোনো নারীদেহ পেলেই তারা ঝাপিয়ে পড়ে সেই দেহের ওপর।

যার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে ছোট নবজাতক মেয়ে শিশু না নাবালক মেয়ে শিশুকে ধর্ষিত হতে দেখা যায়।[32] এমনকি নেক্রোফিলিকদের[33] ঘটনা খবরের কাগজে অহরহ দেখা যাচ্ছে। মৃত নারীদেহ পেলেই যেন তাদের আর হুশ থাকছে না। অটোবর ২২, ২০২৫— তরুণীর মরদেহ ধর্ষণের ঘটনায় লাশবাহকের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে ধর্ষণ,লাশ অবমাননাসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা করে। ধর্ষক স্বীকারোক্তি দেয় এবং মামলা শেষে আদালতে হাজির করা হয়।[34]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পুরুষকে যেমন নজ্বরের হেফাজত করতে এবং চরিত্র হেফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক তেমনি নারীকেও নির্দেশ দিয়েছেন নজ্বরের হেফাজত করতে, পর্দা করতে—নিজেকে ঢেকে রাখতে। মাহরাম পুরুষ ব্যাতিত গায়রে মাহরামদের সাথে পূর্ণ পর্দা করে চলতে। ঘরে অবস্থান করতে এবং অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে না যেতে।

---

[32] সূত্র: প্রথম আলো https://share.google/CQtz8lsvDOJvgz5Ji

[33] যারা মৃতদেহের প্রতি আকৃষ্ট এবং মৃতদেহের সাথে যৌনসঙ্গম করে তাদের নেক্রোফিলিক বলে।

[34] সূত্র: প্রথম আলো https://share.google/p4pW67F7UvaLep1o4

নারী পুরুষ উভয়ে যদি আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলে তাহলেই নারীর প্রতি অন্যায়-অবিচার মুক্ত একটি সমাজ পাওয়া সম্ভব। নারীবাদিদের দাবি নারীরা তাদের খেয়াল খুশিমতো বেপর্দা ঘুরে বেড়াবে। তাদের স্বাধীনতার সজ্ঞায় আরও আছে নারীরা ছোট-বড় যেমন ইচ্ছে পোশাক পরবে। নারী পুরুষ উভয়ের সাথে দেদারসে মিশবে। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় ফ্রি-মিক্সিং করবে। রাত বারোটায় বাসায় ফিরবে। হোস্টেলে রাত ১০ টায় ফেরার আইন করবে। আট দশটা প্রেমিক থাকবে, ব্যাভিচার করবে। কিন্তু নজ্বরের হেফাজতের দায়িত্ব শুধু পুরুষের। যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবাস্তব।

অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়িতে তারা সমর্থন দেবে এবং ধর্ষণ হলে তার দায় শুধু একা পুরুষের হবে। বিশ্বব্যাপি যারা অশ্লীলতা ছড়ানোর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে, নারীদেহকে পণ্যের মতো ব্যবহার করে তারাই আবার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলে। ড্রামা-মুভি সর্বত্র নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেমের জয়জয়গান। সেসবের প্রভাবে যখন নারী পুরুষ ব্যাভিচার করে, সন্তান গর্ভ ধারণ হয় তখন তারা গর্ভপাতের স্বাধীনতা চায়।

সর্বপরি অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, বেহায়াপনা সবকিছুর ফলাফল ভোগ করতে হয় নারীদের। কারণ সন্তান ধারণের ক্ষমতা শুধু নারীরই। এবং মানসিকভাবে যতটা বিপর্যস্ত হয় নারী তার কিছু মাত্রও পুরুষকে ভোগ করতে হয় না। তারা শুধু মজা লুটেই চম্পট দেয়। তাই নিজের মর্যাদা-সম্মান রক্ষার্থে নারীদের পরিপূর্ণ পর্দা করার কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে ইরশাদ করেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚوَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰي وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

হে নবী-পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। নিজ গৃহে অবস্থান কর (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত এবং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার (আহলে বাইত)! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে সর্বতোপ্রকারে পবিত্রতা দান করতে।[35]

[35] সূরা আহযাব, ৩২-৩৩।

উম্মুল মু'মিনীন রাদিআল্লাহু আনহুন্নাগণ মু'মিন নারীদের আদর্শ। তাদের প্রতি যে নির্দেশ করা হয়েছে তা মু'মিন নারীদের প্রতিও নির্দেশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, পরপুরুষের সাথে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলতে। কোমল কণ্ঠে কথা বললে যে সকল পুরুষের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফিতনায় পতিত হবে। নারীরা প্রয়োজনীয় কথা বলবে। অপ্রয়োজনে কথা বলবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও নির্দেশ দিয়েছেন, নারীরা যেন ঘরে থাকে। তারা যেন জাহেলী যুগের মতো সাজ-সজ্জা করে নিজেকে প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। নারীরা যেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ﷺ আনুগত্য করে। তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদের সকল প্রকার মলিনতা থেকে হেফাজত করবেন। তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা নূরে উল্লেখ করেছেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰي جُيُوْبِهِنَّ ۞ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰي عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۞ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَي اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন, যৌনকামনা নেই এমন পুরুষ খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।[36]

আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নাজিলকৃত বিধানগুলোর হিকমাহ কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু একজন মু'মিন মুসলিম এর ঈমানের দাবি এটাই যে সে আল্লাহর বিধান জানার সাথে সাথে তার প্রতি বিশ্বাস আনবে এবং তা মেনে চলবে। মু'মিন কোনো যুক্তির জন্য অপেক্ষা করে না। মু'মিনের মূলনীতি হবে, "শুনলাম এবং মেনে নিলাম"। যেই বৈশিষ্ঠের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

[36] সূরা নূর, ৩১।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۟ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।[37]

নারীর জন্য পর্দার বিধান নারীরই স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ওয়াল জালালের। নারীর জন্য যা কল্যাণকর তা তার চেয়ে বেশি কেউ জানেন না। পর্দা নারীর সম্মানই বাড়াই। নারীকে করে অমূল্যবান। দুনিয়া এবং আখিরাতে নারীকে করে সম্মানীত।

[37] সূরা বাকারা, ২৮৫।

নারীকে ঘর থেকে বের করার প্রক্রিয়া

পশ্চিমা অর্থনীতির পরিবর্তন শুরু হয় ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশায়নের পর। ১৭৫০-১৮৫০ এর মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হয়। বলাই বাহুল্য যে উপমহাদেশ থেকে বিহুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ লুটপাটই এই বিপ্লবের কারণ। ইউরোপ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদ নির্ভর শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ পরিবারসহ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়। কৃষিভিত্তিক বর্ধিত পরিবার থেকে পরিবারগুলো একক পরিবারে বিভক্ত হয়ে যায়।

এরপর ১৯১৪-১৯১৮ এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবং ১৯৩৯-১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আগ্রাসী বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উথান হয়। সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদ বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুই মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক, সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এই দুই বিশ্বব্যবস্থা, যাকে আমরা স্নায়ুযুদ্ধ নামে চিনি। মহাকাশ বিজয়াভিযান থেকে নিয়ে জলে-স্থলে আধিপত্য বিস্তার, কোনোখানেই বাকি নেই। পরস্পরকে অর্থনৈতিকভাবে টেক্কা দেয়ার প্রচেষ্টাও থেমে নেই।

যুদ্ধের কারণে পরিবারগুলোতে নারী-পুরুষের ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। আগে উপার্জনের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ পুরুষের ওপর। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পুরুষরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়। এই শূন্যতা পূরণের জন্য পুঁজিবাদি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকটা নারীদের বেছে নেয়। ১ম বিশ্ব যুদ্ধেই পুঁজিবাদিরা বুঝতে পেরেছিল নারীদের কর্মস্থলে রাখা তাদের জন্য ব্যাপক লাভজনক। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কারখানাগুলোতে নারীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কেননা অসংখ্য পুরুষ নিহত এবং নিঁখোজ। তখনকার কয়েকটা পোস্টার দেখলেই বোঝা যায়, নারীদের শ্রমবাজারে ধরে রাখার ব্যাপক প্রোপাগান্ডা।

“We can do it!”, একটি বিখ্যাত পোস্টার যা ১৯৪৩ সালে J.Howard Miller নারী কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরাও পারবে, উহ্য রয়েছে–

পুরুষরাই শুধু কারখানায় কাজ করতে পারে না নারীরাও পারে। "Rosie The Riveter" নামক এক বিখ্যাত ক্যারেক্টার নির্মাণ করা হয়েছিল। যেখানে দেখা যায় একজন নারী পুরুষদের মতো হাতের মাসল দেখিয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন আমরাও পারি। যা J.Howerd Miller Westinghouse Electric and Manufacturing Company-র জন্য তৈরি করেছিলেন। আমেরিকায় অস্ত্র ও সামরিক ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কারখানায় কর্মরত নারীদের গ্লোরিফাই করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, যাতে নারীরা ব্যাপকভাবে কারখানার কাজে যোগ দেয়। এভাবেই নারীর ঘর সামলানো, পুরুষের জীবিকা অর্জন রূপান্তরিত হলো নারী-পুরুষ উভয়ে কর্মজীবি হওয়ায়।

We can do it! পোস্টারটি মাত্র দু'সপ্তাহ প্রদর্শন করা হলেও এটা তখন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। যা ১৯৮০র দশকের শুরুতে আবারও ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৮২ তে পুনরায় ছাপানো হয় একটি আর্টিকেলে। এই পোস্টারটি এখনো পুঁজিবাদীরা বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করে নারী উন্নয়নের নামে।

নারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে কারখানার মালিকেরা মজা পেয়ে গেল, নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা পুঁজিপতিদের ব্যাপক লাভজনক প্রমাণিত হলো। প্রথমত, নারীদের বেতন কম দিতে হতো। দ্বিতীয়ত, ব্যাপকভাবে চাকরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। বাজারে তখন কর্মী প্রায় দ্বিগুন কিন্তু কাজের পরিমাণ আগের মতোই একই। নারীদের কাজ করা ঐচ্ছিক, না করলেও হয়। কিন্তু পুরুষদের কাজ না করলেই নয়। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়েও কম বেতনে শ্রম দিতে তৈরি থাকে। ১৯৬০-র দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায় ব্যাপক হারে।

পুঁজিপতিরা তো এটাই চেয়েছিল। বেতন যত কম দিতে হবে তাদের পকেটে থাকবে তত বেশি মুনাফা। যে করেই হোক নারীদের শ্রম বাজারে ধরে রাখতে হবে। আর নারীদের শ্রম বাজারে ধরে রাখতে হলে ৩টা কাজ করতে হবে—

১. পরিবার গঠন-কে পেছাতে হবে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার নামে। নারীদের পরিবার বিমুখ করে ক্যারিয়ারমুখী করতে হবে। চাকরি, ক্যারিয়ার, অর্থ উপার্জন—ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মর্যাদা মানদন্ড হিসেবে।

২. যৌবনের প্রথমার্ধে বিয়েকে ভিলেন বানাতে হবে।

৩. বিয়ে, গর্ভধারণ, সন্তান লালন-পালনকে ছোট কাজ, ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিয়ে মানেই ঘরে বন্দি হয়ে যাওয়া। যেন নারী এগুলো করতে অনীহা বোধ করে।

ফলস্বরূপ নারী পুরুষের বিয়ের সময়কাল গড়ায় মাঝবয়সে। ১৯৬০ সালেও মেয়েদের প্রথম বিয়ের গড় বয়স ছিল ২০.৩ বছর আর পুরুষের ছিল ২২.৮ বছর। কিন্তু ২০১০ সালে বিয়ের গড় বয়স দাঁড়ায় মেয়েদের ২৫.৮ এবং ছেলেদের ২৮.৩ বছরে। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা বাড়ে। এবং গত শতকের শেষ চতুর্থাংশে এশিয়া মহাদেশে বিয়ের বয়স পেছানোর হিড়িক পড়ে।

নারীদের শ্রমবাজারে নিয়ে আসার প্রোপাগান্ডায় ব্যবহৃত কিছু পোস্টার।

অসমান দেহ ও মনস্তত্ত্ব

পশ্চিমা বিশ্ব নারীবাদকে উস্কে দিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে। তার মাঝে অন্যতম হলো পুরুষের শারীরিকভাবে প্রবল হওয়া এবং নারীদের দুর্বলতাগুলো[38] অস্বীকার করা। তারা স্বীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নারীদের ওপর পুরুষের সমান বোঝা চাপিয়ে দেয়। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে নারী দেহ এবং পুরুষ দেহের কোনো পার্থক্য নেই।

নারী ও পুরুষের শারীরিক পার্থক্য ব্যাপক। যারা নারী ও পুরুষকে সমান বলে নারীর ওপরই জুলুম করে। মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখি, একজন পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ১৩৩৬ গ্রাম, নারীর মস্তিষ্ক ১১৯৮ গ্রাম; যা পুরুষের তুলনায় ১১% কম। একজন পুরুষের হৃদপিন্ড ৩৬৫ গ্রাম, একজন নারীর হৃদপিণ্ড ৩১২ গ্রাম; যা পুরুষের তুলনায় ১৫% কম। একজন পুরুষের লিভার ১৬৭৭ গ্রাম, একজন নারীর লিভার ১৪৭৫ গ্রাম, যা পুরুষের তুলনায় ১২% কম। একজন পুরুষের দুইটি কিডনীর ওজন ৩২২ গ্রাম, একজন নারীর দুইটি কিডনীর ওজন ২৭১ গ্রাম; যা একজন পুরুষের চেয়ে ২০% কম। দুইটি ফুসফুসের ওজন একজন পুরুষের ১২৪৬ গ্রাম, একজন নারীর ১০১৩ গ্রাম; যা একজন পুরুষের চেয়ে অনেক ২০% কম।

পুরুষের হাড়ের ওজন নারীর চেয়ে ৫০% বেশি। উচ্চতায়ও নারীরা গড়ে পুরুষের চেয়ে ৯% খাটো। পুরুষের চোয়ালের হাড় নারীর চোয়ালের হাড় এর চেয়ে অনেক বড়। নারীদের মেরুদন্ডের হাড় অত্যাধিক বাঁকা। যা পুরুষের অপেক্ষাকৃত সোজা। নারীর হাত অত্যাধিক ছোট পুরুষের হাতের চেয়ে। একইভাবে পায়ের পাতাও নারীর ছোট, পুরুষের চেয়ে। পেলভিক বা কোমরের হাড় পুরুষের সংকোচিত, নারীর অনেক বেশি প্রসারিত।

Journal of Applied Psychology এর প্রকাশিত তথ্যানুসারে, ছোটবেলা থেকে প্রায় সমান হলেও কৈশোরের পর ছেলে-মেয়ে উভয়ের পেশী দ্রুত বাড়ে কিন্তু ছেলের তুলনায় মেয়ের পেশী বাড়ে কম। গড়ে একটি মেয়ের শরীরের উপরাংশের পেশি একটি ছেলের চেয়ে ৪০% কম থাকে। এবং নিচের অংশের মেয়ের চেয়ে ছেলের পেশী ৩৩% বেশি থাকে। ২০-৩০ বছর বয়সে পেশী থাকে সবচেয়ে বেশি। এরপর ধীরে ধীরে কমতে থাকে কিন্তু মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কমার হার অনেক কম।

---

[38] প্রকৃত অর্থে শারীরিকভাবে দুর্বল ও কম শক্তিশালী হওয়াই স্বাভাবিক এবং এটাই নারীদের জন্য কক্যাণকর।

Warwick Medical School এর Professor Paul Thornalley BBC কে বলেছেন, নারী দেহে ক্রিয়া বিক্রিয়ার হার কম, তাপ উৎপন্ন হয় কম। নারীদের শরীরে কম তাপ উৎপাদন হয় এবং নারীদের ঘাম কম হয়; অর্থাৎ তাপ বের করার সুযোগ তাই কম। গ্রীষ্মকালে নারীদের জন্য গরম বেশি লাগে। শীতকালে শীত বেশি লাগে। যার দরুণ গ্রীষ্মে নারীরা রোদে কাজ করা নারীর জন্য বেশি কষ্টকর আর শীতকালে নারীদের জন্য বসে থাকা বেশি কষ্টকর কারণ শরীরে তাপ কম উৎপন্ন হয়।[39]

জাপানের Osaka International University এবং Kobe University-র যৌথ গবেষণায় এমনটিই উঠে এসেছে।
গবেষণার প্রধান সমন্বয়ক Yoshimitsu Inoue জানাচ্ছেন, মেয়েদের শরীরের পানির পরিমাণ এমনিতেই পুরুষের চেয়ে কম। ফলে দ্রুত পানিশূন্যতা হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই হতে পারে এই কম ঘামাটা নারীদের জন্য গরমে একটা সারভাইভাল কৌশল বা অভিযোজন। আর পুরুষের এই বেশি ঘামাটা কাজে দক্ষতা বজায় রাখার একটা কৌশল।

নারীদের রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ 3.9-4.7 ×10^12mcl, পুরুষের রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ 4.5-5.0 ×10^12 mcl. হিমোগ্লোবিন নারীর রক্তে 120-140g/l, পুরুষের রক্তে 140-160g/l. হিমোগ্লোবিন কম থাকায় নারীদেহে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কম যার জন্য নারীরা দ্রুত হাঁপিয়ে পড়ে।

এছাড়াও মাসের বিশেষ সময়ে নারীদেরকে বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সবচেয়ে কমন লক্ষণ হিসেবে বিশেষ সময়ের ৩-৭ দিন পূর্বে খিটখিটে মেজাজ, উদ্বেগ-টেনশন, মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন হওয়া ইত্যাদিতে ৮০% নারী ভোগেন বলে জানা যায়। প্রায় ৫০% নারী জানিয়েছেন তারা মনোযোগ সমস্যা, ভুলে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন। ৪৮% নারী পেটের সমস্যায় ভোগেন। এই তথ্যগুলো Patricia O. Chocano-Bedoya, Elizabeth R. Bertone-Johnson বলেন Women and Health (Second Edition), 2013 এ।

জন্ম থেকেই নারী পুরুষের দেহ-মন-মস্তিষ্ক সব ভিন্ন হয়। যা আমরা "বিকৃত মতবাদ" আলোচনা করেছি। স্ট্রোকের রোগীদের ওপর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান পুরুষরা

[39] Source: The Lancet https://share.google/PS5t3sOxWBsY8VhJa

স্ট্রোক করে ব্রেইনের কথা বলার অংশ কার্যক্ষমতা নষ্ট হলে পুরুষরা কথা বলার ক্ষমতা হারান। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না। নারীর মস্তিষ্কে কথা বলার অংশে কার্যক্ষমতা হারালেও নারী কথা বলতে পারেন। কারণ পুরুষদের মস্তিষ কাজ করে ফাংশনালি। নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অংশ সকল কাজে ব্যবহৃত হয়। নারী-পুরুষ দেখেও ভিন্নভাবে। নারীরা দুনিয়াকে কিছুটা লালচে দেখে। পুরুষরা দুনিয়াকে কিছুটা নীলচে দেখে। রঙের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নারী যত রঙ চেনে পুরুষ তত রঙ চেনে না। পুরুষরা বিভিন্ন রঙের শেড চিহ্নিত করতে পারে না যা নারীরা পারে। নারীদের চিন্তা করার প্রক্রিয়া এবং পুরুষদের চিন্তা করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেকোনো বিষয়ে পুরুষ যেভাবে ভাবে নারী সেভাবে ভাবে না। পুরুষ প্রতিকূল পরিবেশে দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু নারী সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। কর্মক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ একই সময়ে সমান কাজ করতে পারে না।

নারীর ভীত হওয়ার প্রবণতা নারীর জন্য মাতৃসুলভ আচরণের জন্য অধিক কার্যকরী। তাই মায়েরা সবসময় সন্তানকে নিয়ে আগাম ক্ষতি আশংকা করে এবং সেই অনুসারে প্রস্তুত থাকে। দেখা যায় মায়েরা যেকোনো সমস্যা সন্তান প্রকাশ করা আগেই বুঝে যায়। যা বাবারা পারেন না। সন্তানের যে কোনো ক্ষতির আগে দেখা যায় মায়েরা সেটা টের পেয়ে যান। সন্তানকে যেকোনো ক্ষতি থেকে বাঁচাতে মা সর্বদা আগলে আগলে রাখেন। আবার বাবারা এমন না হওয়া কঠোর হয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জরুরী। যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হিকমাহরই বহিঃপ্রকাশ। পুরুষকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নারীর ওপর অভিভাবকত্ব দিয়েছেন। যার কারণে দেখা যায় পুরুষদের ডমিনেট করার প্রবণতা থাকে বেশি। এই স্বভাব তার কর্তৃত্ব করা জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের ভালোর জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে জরুরী।

অর্থাৎ নারী পুরুষ এক নয়। পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া মতবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভুল। একই পরিবেশে, একই কাজ উভয়ে করতে পারে না। পুরুষদের মতো নারীদের একই কাজ করতে দেওয়া নারীর ওপর জুলুম। পুরুষের সাথে নারীকে তুলনা করা নারীকে ছোট করা, অবমূল্যায়ন করা। দৈহিক পার্থক্য স্বাভাবিক এবং এমনটাই নারীদেহের জন্য উপযুক্ত। নারী এবং পুরুষ কখনোই সমান নয়। নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারীর যা ঘাটতি তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পুরুষ দ্বারা পূরণ করান আর পুরুষের যা ঘাটতি তা নারীর দ্বারা পূরণ করান।

বর্তমান বাংলাদেশে অধিকাংশ মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকে এমনভাবে বড় করা হয় যেন তারা মেয়ে নয় বরং ছেলে। তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই এই দীক্ষা দেওয়া হয় যে ঘরে থাকা মানে বন্দি হয়ে থাকা। জ্ঞান অর্জন নয় বরং উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হবে চাকরি করার জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য। অর্থ উপার্জন না করলে স্বামী-শ্বশুরবাড়ির মানুষ মূল্য দিবে না। স্বামীর আনুগত্য করা মানে স্বামীর দাসী হয়ে থাকা।

এই অভিযোগগুলো একদমই অমূলক নয় কিন্তু কিছু সংখ্যক পুরুষ এবং তার পরিবারকে দিয়ে সমস্ত পুরুষজাতিকে বিচার করা উচিত নয়। কেউ আপনার ওপর অত্যাচার করবে এই ভয়ে আপনি বাঁচার চেষ্টায় আপনার ভুল পথ অবলম্বন করে স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করে নিজেই নিজের ওপর জুলুম করবেন। এটা কি সমাধান? না, বরং এটা অত্যাচারীর অত্যাচারকে বৈধতা দেওয়ারই নামান্তর। বরং আপনার উচিত সমাধানের পথে হাঁটা। অত্যাচারের প্রতিবাদ করা এবং সেটা সঠিক পন্থায়।

নারীকে নারীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া উচিত। নারীর অধিকারের নামে নারীকে পুরুষের সাথে তুলনা করে পুরুষের কাজ করতে দেওয়া নারীর ওপর অত্যাচার যা পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে বর্তমানে মুসলিম পরিবারগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারগুলো এখন মেয়েদের চাকরি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। যারা ফিতরাতগতভাবে চাকরি করতে, ব্যবসা করতে না চায় তাদেরকে সইতে হয় না লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আর যে পরিবারগুলোতে মেয়েরা বাইরে কাজ করাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে তাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে ঘর-বাহির উভয়ের দায়িত্ব। বাইরে তারা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে না। যে সকল নারীর পরিবারে উপার্জনক্ষম মাহরাম পুরুষ নেই তাদের বিষয় ভিন্ন। তারা পর্দা রক্ষা করে প্রয়োজন মাফিক অর্থ উপার্জন করতে পারে হালালভাবে।

কারণ ফিতরাতগতভাবেই তাদের মন ঘরে পড়ে থাকে। তারা না পারছে একজন নারীর মতো বাঁচতে না পারছে একজন পুরুষের মতো বাঁচতে। ভেতর থেকে নারী জাতি যে যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে তারা তা না পারছে সহ্য করতে না পারছে এর থেকে বাঁচতে। নারীবাদের নামে সমাজের অল্প কিছু সংখ্যক সমতা নামের যে মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ছুটছে আদতে তা অর্জন করা তো কখনোই সম্ভব নয়। বরং দেশের বাকি নারীদের প্রতি মিথ্যা সমতা-অধিকারের স্ট্যান্ডার্ড দাড় করিয়ে তারা দিনের পর দিন জুলুমই করে যাচ্ছে।

এর বাইরে পরিবারগুলোতে চাকরি-ব্যবসা-পড়াশোনা ইত্যাদির ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশের জন্য পরকিয়া-প্রেম পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। চাকরিজীবি মায়ের সন্তানরা হচ্ছে মায়ের আদর মমতা থেকে বঞ্চিত। যেখানে মায়ের কাছ থেকে উত্তম তারবিয়াহ পাওয়ার হক্ব ছিল সেখানে তারা পাচ্ছে কাজের লোকের সেবা। স্বাভাবিকভাবেই কাজের লোক দায়সারাভাবেই বাচ্চাদের বড় করে।

কাজের লোক এমনকি এখন মায়েরাও নিজেদের কাজের সুবিধার্থে বা সময় বাঁচানোর অজুহাতে বাচ্চার হাতে ফোন তুলে দেন। ফলস্বরুপ জন্মের ১-২ বছর থেকেই বর্তমান প্রজন্ম মোবাইল ফোনে অভ্যস্ত নয় শুধু আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে আজ এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ছেলে-মেয়েরা আগে যেখানে মা-বার সাথে সময় কাটিয়ে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে খেলা-ধুলা করে বড় হয়েছে আজ সেখানে তারা সারাক্ষণ এক মোবাইল ফোনে বুদ হয়ে রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহারের কারণে চোখের সমস্যা, মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এখন নিত্যদিনকার খবর।

নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ইত্যাদি অতিশয় প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সমাজে নারী ডাক্তার, নারী শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।। পর্দা রক্ষা করে নারীদের চিকিৎসা অর্জনের জন্য নারী চিকিৎসকের প্রয়োজন। নারী জাতিকে শিক্ষিত করতে নারী শিক্ষকের প্রয়োজন। যার জন্য নারীদের একটি অংশকে ডাক্তার, শিক্ষিকা, নার্স এবং ইত্যাদী সংশ্লিষ্ট পেশায় কাজ করা জরুরী। কিন্তু এই সংখ্যাটা নির্দিষ্ট এবং প্রয়োজন অনুপাতে হওয়া উচিত। যাদের মাহরাম নেই ও খোরপোষের জন্য কাজ করা প্রয়োজন তাদের জন্য নারী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী। নারী বান্ধব কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা মুসলিম হিসেবে আমাদেরই দায়িত্ব।

সুখী পরিবার গড়তে, সন্তানদের প্রকৃত মানুষ রুপে গড়ে তুলতে নারী-পুরুষের আদি ভূমিকায় ফিরে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। নারীদেরকে ঘর এবং পুরুষদের বাহির সামলানোতেই প্রকৃত সমাধান। সমাজকে বাঁচাতে হলে পরিবারকে রক্ষা করতে হবে। মুসলিম পারিবারের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে নারী-পুরুষকে তাদের সহজাত ভূমিকায় ফিরে যেতে হবে।

মিডিয়া আগ্রাসন এবং উম্মাহ

মিডিয়ার(Media) বাংলা প্রতিশব্দ যোগাযোগ ও গণমাধ্যম। কোনো কিছু প্রচারে যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাই গণমাধ্যম বা মিডিয়া। মিডিয়া প্রধানত দু'প্রকার। এক প্রিন্ট মিডিয়া এবং দুই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়া হওলো পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হলো স্যাটেলাইট, মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লগ, ভ্লগ, কম্পিউটার, টিভি, রেডিও ইত্যাদি। মিডিয়ার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। মিডিয়ার ধারক-বাহক মিডিয়াকে যে কাজে ব্যবহার করে মিডিয়া সেই কাজেই ব্যবহৃত হয়। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জড়বস্তুরই ক্ষেত্রেই একই নিয়ম।

যোগাযোগ মাধ্যমে মূলত এমন কিছু কাজের সমষ্টি যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাধারা-ভাবধারা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদান ও মত বিনিময় এমন সব উপকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেগুলোকে পৃথক দু'টিভাগে বিভক্ত করা যায়—

১. এমন সীমিত উপকরণ, যা সীমিত ব্যক্তিকে পরস্পর মিলিয়ে দেয়। সেসব উপকরণের মধ্যে টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল ইত্যাদির সাথে সাথে সমাবেশ, সম্মেলন, কনফারেন্স, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ এগুলো পরস্পরকে মিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

২. এমন উপকরণ, যা অগণিত ব্যক্তি পর্যন্ত কথা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। এর মধ্যে পত্র-পত্রিকা, টিভি-ভিসিআর, সিনেমা-ফিল্ম, টিভি-র বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে এই সবগুলোর বিকল্প হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া।

আজ মুসলিম উম্মাহ উভয় প্রকার মিডিয়ার আবদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলিমদের আমল-আক্বীদা সমূলে ধ্বংস করার জন্য মিডিয়াকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুইজারল্যান্ডের বাজেল নগরীতে অস্ট্রেলিয়ার ধূর্ত ইহুদী সাংবাদিক ড. থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে বিশ্ব ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তারা সমস্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও সুপরিকল্পিত নীলনকশা প্রণয়ন করে। তারা সকলে একমত হয় যে, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমত দুনিয়ার সকল

স্বর্ণভান্ডার আয়ত্ত করতে হবে এবং সূদী অর্থ ব্যবস্থার জাল বিস্তার করে পৃথিবীর সকল পুঁজি তাদের হস্তগত করতে হবে। এরপর তারা স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম যেন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে চলে আসে এবং মিডিয়ার সাহায্যে দুনিয়াবাসীর মগজধোলাই প্রক্রিয়া শুরু করে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। সংবাদমাধ্যম তথা সকল প্রচার মাধ্যমের অসাধারণ গুরুত্ব, প্রভাব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ড. থিওডর বলে, 'আমরা ইহুদীরা পুরো বিশ্বকে শোষণের পূর্বশর্ত হিসেবে পৃথিবীর সকল পুঁজি হস্তগত করাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। তবে মিডিয়া আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। আমাদের শত্রুদের পক্ষ হতে এমন কোন শক্তিশালী সংবাদ প্রচার হতে দেব না, যার মাধ্যমে তাদের মতামত জনগণের কাছে পৌছতে পারে।'

বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা হ'ল রয়টারস। পৃথিবীর এমন কোন সংবাদপত্র, রেডিও সেন্টার, টিভি সেন্টার ও স্যাটেলাইট নেই যারা রয়টারস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দু'টি প্রচার মাধ্যম 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা'ও প্রায় নববই ভাগ সংবাদ রয়টারস থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত এই সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার ১৮১৬ সালে জার্মানির এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার এই সংবাদপত্রের কার্যক্রম অতি সহজেই বিশ্বময় স্থান লাভ করেছিল। এখন তো রয়টার ছাড়া পৃথিবী যেন অচল। রয়টারস হচ্ছে আকাশ সংবাদসংস্থার রাজাধিরাজ।

ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাঈল, ভারত ও মার্কিন ইহুদী লবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইহুদীরা স্বীয় প্রটোকল প্রস্তুত করার পূর্বেই ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংবাদ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই এজেন্সিকে আমেরিকার পাঁচটি বড় বড় দৈনিক মিলে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' নামে প্রতিষ্ঠা করে। অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কাজ শুরু করে এবং আমেরিকায় প্রকাশিত সকল পত্র-পত্রিকাসহ গোটা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে।

১৯৮৪ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উক্ত এজেন্সীর সাথে আমেরিকার তেরশ' দৈনিক, তিন হাজার সাত শত আটাশিটি রেডিও এবং ৮৮টি টিভি স্টেশন জড়িত আছে। আমেরিকার বাইরে এগার হাযার নয় শত সাতাশ (১১৯২৭)টি দৈনিক ও রেডিও, টিভি স্টেশন জড়িত আছে। স্যাটেলাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে দৈনন্দিন এক কোটি সতের লাখ শব্দ সম্বলিত লেখা মিডিয়াকে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড প্রেস', ১৯০৯

সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস' যা ১৯৫৮ সালে একীভূত হয়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর মালিকানায় চলে আসে। এটি পরিচালিত হয় ইহুদী মালিকের অধীনে।

ইহুদী প্রচার মাধ্যমগুলো বিশ্বময় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা আন্তর্জাতিক সূত্রগুলোকে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে মার্কিন-ইহুদী প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়া যায়।

তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সফল হয়েছে। ইতীমধ্যে মুসলিম উম্মাহকে তারা দু'ভাগে বিভক্ত করতে সফল হয়েছে। এক ভাগ হলো মডারেট মুসলিম অপর ভাগ হলো মৌলবাদী মুসলিম। মডারেট মুসলিম হলো তারা যারা নামে মুসলিম কিন্তু জীবনাচারে কাফিরদের সাথে কোনো পার্থক্য নেই। আর মৌলবাদী মুসলিম হলো তারা যারা জীবনে এবং জমিনে উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন চায়। সগৌরবে ইসলাম পালন করতে চায়। নাটক, সিনেমা, গল্প, উপন্যাসের মাধ্যমে প্রচার করে ধর্মীয় অনুশাসন পালনকারীরা হলো চরমপন্থী, উগ্রবাদী, মৌলবাদী।

পশ্চিমা মিডিয়া 'ওয়ার অন টেরর' এর বয়ানের মাধ্যমে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছে যে মডারেট মুসলিমরা ভালো মুসলিম আর যারা ইসলামকে ধারণ করে তারা জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী মুসলিম। চরম আফসোসের কথা হলো মিডিয়ার বয়ান দ্বারা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর মগজধোলাই হয়ে গিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার জাল দ্বারা বিশ্বকে করায়ত্ত করেছে। মুসলিমদের ওয়ার্ল্ডভিউ বা জীবনদর্শন আজ পশ্চিমা লেন্স। পশ্চিমাদের এঁকে দেওয়া ছকেই মুসলিম্রা চিন্তা করে। এর বাইরে কোনো কিছু আছে তারা তা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। আজ মুসলিম মা-বাবারা সন্তানকে পশ্চিমাদের অণুকরণে বড় করে। মুসলিমরা ভুলে গিয়েছে তাদের গৌরবান্বিত ইতিহাস। আবু বকর, উমার, উসমান, আলীর ইতিহাস। মুসলিমরা ভুলে গিয়েছে মুসলিমদের বিজয় আর রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস।

নাচ-গান, সিনেমা-নাটক দেখিয়ে; হাল আমলে রিলস দেখিয়ে সন্তানদের বড় করা হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা শিশুর হাতে ফোন দিয়ে রাখা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে মুসলিমদের

ধ্যান-ধারণা হলো নাচ-গান করা, বেপর্দা হয়ে চলা হলো আধুনিকতা। আর নিয়মিত সালাত আদায় করা, পর্দা করা, দ্বীন মানা হলো পশ্চাৎপদতা। উপরন্তু দ্বীন মানাকে সন্ত্রাসবাদ জ্ঞান করা হয়।

আজ আমরা দেখতে পাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা কার্যত আমেরিকার গোলামি করছে। তারা উম্মাহর সাথে মুনাফেকি করছে। গাজ্জা, সুদান, উইঘুর। ইয়েমেন হত্যাযজ্ঞে তারা নিরবতা পালন করছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও আমেরিকার কর্তৃত্ত বিরাজ করছে। যেই শাসক তাদের গোলামি করবে আমেরিকা তাকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে। স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করার কোনো ক্ষমরা কার্যত এইসব শাসকের নেই। যদিও বছরের পর বছর তাদের গোলামি করলেও শেষ রক্ষা হয় না।

পশ্চিমা মতাদর্শের প্রচারে আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বেও সফল হয়েছে। আমেরিকার গোলামি করতে গিয়ে বাংলাদেশে হাসিনা সরকার ১৫ বছরে হাজার হাজার মানুষ গুম-খুন করেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে জঙ্গী ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞাপনে দেখিয়েছে যারা গান গায় না, মেয়ে বন্ধুর সাথে চলা ফেরা করে না, জন্মদিন পালন করে না, পাশের বাসার ছাদে কাপড় শুকাতে দিতে আসা মেয়ের দিকে তাকায় না তারা হলো জঙ্গি-সন্ত্রাসী। ফজ্বরের নামাজ পড়লে জঙ্গি, নামাজ পড়ার আহবান করলে জঙ্গি, ইসলামি বই পড়লে জঙ্গি। নামাজে ডাকায় আবরার ফাহাদের মতো অসংখ্য তরুণকে জীবন দিতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে মুসলিম ছেলেদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে তাদেরই জাতি ভাই। অপরাধ শুধু একটাই, দ্বীন মেনে চলা।

খুনি হাসিনা সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ দমনের নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। মিথ্যা নাটক সাজিয়ে জেল-জুলুমের মাধ্যমে অগণিত পরিবার ধ্বংস করেছে। ২০২৪ এর জুলাই আন্দোলনের পর আল্লাহর অশেষ রহমাহতে খুনি হাসিনার দুঃশাসন থেকে এদেশ মুক্তি পেয়েছে। হাসিনার পতনের পর আয়নাঘর উন্মোচন হলে দেশের মানুষের কাছে জঙ্গি নাটকের রহস্য-উন্মোচন হয়। কিন্তু এখনো পশ্চিমা থাবা থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়নি। এখনো পশ্চিমারা তাদের গোলাম সেক্যুলার-মডারেট শ্রেণীদের দিয়ে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

নাটক-সিনেমা, ওয়েবসিরিজ ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রসারের পর বর্তমান বাংলাদেশে অশ্লীলতা সাহসীকতা আর আধুনিকতার নাম। ছেলে-মেয়েদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক এখন সমাজে খুবই স্বাভাবিক। মা-বাবারাই এখন চান সন্তানরা হারাম রিলেশনে লিপ্ত হোক। সমাজে

এখন লাভ ম্যারেজ অতিশয় স্বাভাবিক। অবৈধ সম্পর্ককে কেউ গুনাহের বিষয় হিসেবে দেখে না। ঘন্টার পর ঘন্টা ছেলে মেয়েরা নেটফ্লিক্সের মুভিতে বুঁদ হয়ে থাকে। দিনের পর দিন গান শুনে গুনাহের প্লে-লিস্টের সাথে সাথে গুনাহের পায়া ভারী করে।

বর্তমানে এদেশে ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের নামে মুসলিমরা অশ্লীলতা, নির্লজ্জতার চরম শিখরে পৌছেছে। ঘরে ঘরে আজ ভ্লগার। ঘরে ঘরে ভিডিও করে ডলায় আয় আর ভাইরাল হওয়ার নেশা। যেন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত ভিডিও মেকিংয়ের পেছনে ছুটছে এই জাতি। ভিডিও তৈরির কারণে নষ্ট হচ্ছে পারিবারিক প্রাইভেসি। এখন একজন সাধারণ মানুষের জীবনেও গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সবই উন্মুক্ত।

পশ্চিমা বিশ্ব সমকামিতা, উভকামিতা ইত্যাদি বিকৃত মতাদর্শ বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪ এর পাঠ্যপুস্তকে 'শরীফ-শরীফা' গল্পের মাধ্যেমে ইতিমধ্যে তারা শিশুদের মগজধোলাইয়ের বন্দোবস্ত করছে। বিকৃত আদর্শ সমকামিতার প্রসারের মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে। এখন খবরের কাগজে সমকামিতার খবর সাধারণ এক সংবাদ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দ্বারা সমকামিতাকে স্বাভাবিকিকরণ করেছে। প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয় রমনা পার্কের আলো আঁধারিতে সমকামিদের মিলনমেলার খবর।

এদেশে সমকামিদের দৌরাত্ব এতটাই বেড়েছে যে তারা সমকামী বিরোধীদের হত্যার হূমকি দেয়। বিশবিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককে ড. মুহাম্মদ সরোয়ার হোসেইন এবং আসিফ মাহতাব উৎসকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয় সাফওয়ান চৌধুরী রেভিল নামের এক এলজিবিটি এক্টিভিস্ট। ভয়ংকরভাবে মাথা দিয়ে ফুটবল খেলার ছবি অংকন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের হুমকি দেওয়া হয়। শিক্ষক দুজন প্রশাসনের দারস্থ হন। কিন্তু বাংলাদেশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুজন শিক্ষকের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সমকামী সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিদ্বেষ ছড়ানোর অন্যতম কারণ হলো পশ্চিমা পুঁজিবাদ সর্বস্ব অর্থ ব্যবস্থা, সমগ্র বিশ্ব পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণ ধ্বংস সম্ভব একমাত্র ইসলামি আদর্শ দ্বারা। গ্রেটার ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রধান বাঁধা হলো সচেতন মুসলিমরা। সচেতন সাহসী মুসলিমদের দমনে এতটা উগ্র ও উদ্ধত।

মিডিয়া আগ্রাসন থেকে বাঁচতে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে মিডিয়া তৈরির কোনো বিকল্প নেই। পশ্চিমাদের বিপরীতে মুসলিমদের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুব সমাজের মাঝে ব্যাপক দাওয়াতি কার্যক্রম করতে হবে। কারণ যে সমাজে যুবসমাজ জাগ্রত হয় সে সমাজকে শাসন করা অসম্ভব। আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে দেশে মুসলিম যুবসমাজে ইসলামি জাগরণ হচ্ছে। তবে তা আশানুরূপ নয়। এই জাগরণের আরও ব্যাপক বিস্তৃতি সাধনে দল-মত নির্বিশেষে দাওয়াতি কাজে মনোনিবেশ করতে হবে। তাওহীদি প্রজন্ম গড়ে তুলতে কাজ করতে হবে।

বিকৃত মতবাদ

পশ্চিমা দেশগুলোতে বর্তমানে সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে চলছে বিকৃত মতবাদের জয়জয়কার। এলজিবিটি এক্টিভিস্টদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমান পশ্চিমা দুনিয়া সদা সচেষ্ট। এই মতবাদের সৃষ্টি হয় মনোবিজ্ঞানী দ্বারা। যার নাম জন মানি। তার মতে শিশুরা জন্মের সময় একইভাবেই জন্মায়, মা-বাবারাই তাকে ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে বড় করে তোলে। ছেলের শরীরের কেউ চাইলেই নিজেকে মেয়ে মনে করতে পারে, মেয়ের শরীরের কেউ চাইলেই নিজেকে ছেলে মনে করতে পারে।

জন মানি সর্বপ্রথম "জেন্ডার" শব্দটিকে একটি দর্শন হিসেবে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন মানুষ তার যে লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেটা হলো বায়োলজিকাল সেক্স আর নিজেকে সে যেটা মনে করে বা যেটা হিসেবে দেখতে চায় সেটা হলো জেন্ডার আইডেন্টিটি। কেউ ছেলে হলেও নিজেকে মেয়ে দাবী করতে পারে, মেয়ে হলেও নিজেকে ছেলে দাবী করতে পারে। বর্তমান সমকামী, উভকামী, শিশুকামী অর্থাৎ এলজিবিটিকিউ তার এই থিউরির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

জন মানি হলেন একজন স্বস্বীকৃত শিশুকামী। তার বিকৃতকামীতার শিকার হতে হয়েছে বহু শিশুকে। যার জন্য রচিত হয়েছে ব্রাশ ও ব্রায়ান এর মতো শিশুদের জীবন ধ্বংসের নির্মম গল্প। জন মানি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই আর্টকেলটি সহায়ক হবে।[40]

এই মতবাদ মানবজাতির ইতিহাস এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষের বংশবিস্তারের নিয়মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তার মতে নারীকে নারী পরিবার এবং সমাজ নারী হিসেবে গড়ে তোলে আর পুরুষকে পুরুষ হিসেবে পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলে। জন মানির এই মতবাদ পশ্চিমা বিশ্ব ব্যাপকভাবে গ্রহণ করল। ১৯৭০-৮০ দশকে পশ্চিমা দুনিয়ায় সেক্সুয়াল রেভোলুশান বা যৌন বিপ্লব হল। মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক যৌনতার সকল ধারণা ভেঙে দিয়ে পশ্চিমা দুনিয়া নতুন এক স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করল।

কিন্তু বাস্তবে জন মানির এই থিওরি সম্পূর্ন ভুল। একটা মানুষ জন্মের সময় বায়োলজিকালি যে লিঙ্গ নিয়ে জন্মায় মানসিকভাবেও সে সেই লিঙ্গ নিয়েই জন্মায় যদি না কোনো প্রকার

[40] পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি! পর্ব-২ by Asif Adnan
https://hoytoba.com/id/4424

হস্তক্ষেপ করা হয়। যদি কোনোভাবে তাতে বাঁধা দেওয়া না হয়। বাইরে থেকে ঔষধের মাধ্যমে বা যে কোনো ড্রাগের মাধ্যমে। তাহলে সে শারীরিকভাবে পুরুষ হলে মানসিকভাবেও পুরুষ হয়েই জন্মায়, মেয়ে হলে মানসিকভাবে মেয়ে হিসেবে।

একটা মানুষ ছেলে হবে নাকি মেয়ে সেটা তার বাবার শুক্রাণুর সাথে যখন মায়ের ডিম্বাণুর জাইগোট তৈরি হয় তখনই নির্ধারিত হয়ে যায়। এখনো পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের মত অনুসারে মায়ের ক্রোমোসোম সর্বদা XX ই থাকে এবং বাবার ক্রোমোসোম XY থাকে। যদি বাবার ক্রোমোসোম Y হয় তাহলে মায়ের X এবং বাবার Y মিলিত হয় এবং এই সন্তান হয় ছেলে। যদি বাবার ক্রোমোসোম X হয় তাহলে মায়ের ক্রোমোসোমের সাথে মিলিত হলে সেই সন্তানটি হয় মেয়ে।

ক্রোমোসোম মিলিত হওয়ার পর সন্তানটা যখন ছেলে হয় তখন বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। ৬ সপ্তাহ বয়সে ভ্রুণের টেস্টিস থেকে তিন ধরণে হরমোন তৈরি শুরু হয়। ইসলাম যে একমাত্র সত্য ধর্ম এখানেও তার প্রমাণ মিলে। হাদীসে উল্লেখিত আছে গর্ভের সন্তানের বয়স যখন ৪০ দিন হয় তখন একজন ফেরেশতা লিখে দেন সন্তানটা ছেলে হবে নাকি মেয়ে । সন্তানটা নেককার হবে না বদকার হবে। তার হায়াত কত দিনের হবে ইত্যাদি।

সেই তিনটি হরমোন হলো AMH, Testosterone, Insl3। AMH হরমোনটির কাজ হলো নারীর অঙ্গগুলো(ডিম্বাণু, বার্থ ক্যানেল, জরায়ু, ফেলোপিয়ন টিউব ইত্যাদি) হওয়ার সম্ভাবনাগুলো ধ্বংস করে দেয়। Testosterone হরমোনের কাজ হলো পুরুষদের অঙ্গগুলো(শুক্রাণু, শুক্রাশয়, শুক্রনালী, অন্ডথলি, পেনিস ইত্যাদি) তৈরি করা। Insl3 এই হরমোনের কারণে টেস্টিস অন্ডথলিতে এসে পৌছায়। মায়েদের ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস(বর্তমানে নয় আগের ঔষধগুলো) এর ঔষধ খেলে সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে তার অঙ্গ গঠনে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ ডায়াবেটিসের ঔষধ কিছুটা মেয়েদের হরমোনের মতো কাজ করে এবং টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণে বাঁধা দেয়।

১৯৪০-৫০ এর দশকে মায়েরা গর্ভের সন্তান যেন গর্ভপাত না হয় তাই মায়েরা একটা ঔষধ সেবন করতো। এই ঔষধ ছেলে হরমোনের মতো কাজ করতো যার কারণে মেয়ের লিঙ্গ অস্পষ্ট হয়ে যেত। মেয়ের শরীরে ছেলের অঙ্গ ডেভেলপ করে যেমন পেনিস, শুক্রাশয় ইত্যাদি। অর্থাৎ বাইরে থেকে ঔষধের প্রভাবে সন্তান ছেলে হলেও তাতে পরিবর্তন হয়, এভাবে সন্তান হিজরা হয়।

এই তিনটি হরমোন দ্বারা শুধু লিঙ্গই নির্ধারিত হয় না বরং এই হরমোনগুলো মস্তিষ্কেও ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলেন, Brain is the largest sex organ. ৬ সপ্তাহ বয়সে ছেলে ভ্রূণের হরমোন নিঃসরণ হয় এবং মেয়ে ভ্রূণের হরমোন নিঃসরণ হয় না। এর ফলে তাদের ব্রেইনের ম্যাপিং ভিন্ন হয়ে যায়, তাদের ব্রেইনের স্ট্রাকচার ভিন্ন হয়ে যায়, আকার ভিন্ন হয়।

অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা যেভাবে বলতে চায়, সবাই সমান জন্ম নেয় মা-বাবাই তাকে ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বরং ৬ সপ্তাহ বয়স থেকেই ভ্রূনের ব্রেইন তার লিঙ্গ অনুসারে গঠিত হয়। জন্ম থেকে সন্তান মানসিকভাবে ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে জন্ম নেয়।পশ্চিমারা হিজরা জনগোষ্ঠীর আড়ালে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। হিজরা হলো জন্মগতভাবে শারীরিক লৈঙ্গিক ত্রুটিযুক্ত মানুষ। আর ট্রান্স জেন্ডার হলো জন মানির মতবাদের মানুষ। যারা নিজেকে মনে মনে ছেলে ভাবে অথবা মেয়ে ভাবে। জন্মগত ছেলে নিজেকে মেয়ে দাবী করে মেয়ে নিজেকে ছেলে দাবী করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেরা নিজেকে মেয়ে দাবি করে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় দেয়। এই অনাচারের কারণে মূলত নারীদেরই ভুগতে হয়। কেমনা ছেলে যখন নিজেকে মেয়ে দাবী করে তখন সে নারীদের স্থানে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায়। এতে নারীদের প্রাইভেসি নষ্ট হয়। নারী দাবি করায় সে অনেক রকম সুবিধাও পেয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই নারীরা একজন জন্মগত পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। U.S Masters Swimming Spring National Championship এ চ্যাম্পিয়ন হয়ে একজন জন্মগতপুরুষ পাঁচটি গোল্ড মেডেল জিতেছেন।

নারীদের স্পেসে প্রবেশাধিকার নিয়ে নারীদের যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ এখন পশ্চিমা সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে খুনের পর জেলে থাকা অবস্থায় সেই ব্যক্তি নিজেকে মেয়ে দাবী করে, এতে তাকে মেয়েদের জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেই ব্যক্তি দুজন নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করে। পরবর্তীতে তাকে আবারও পুরুষদের জেলে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে যখন যেভাবে ইচ্ছে নিজের ফায়দা লুটার জন্য হঠাৎ নিজেকে মেয়ে দাবী করতে পারে আবার ছেলেও দাবী করতে পারে।

বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্ট দিনকে দিন বাড়ছে। আমেরিকা ও পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের অর্থায়নেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই মতবাদ ছড়ানো হচ্ছে। মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের

সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিগত ২-৩ বছরে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার বিকৃতকামীদের হার অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। এই সকল বিকৃত কামী সমকামিতার প্রসারের জন্য বায়োলজিকার সেক্স আর জেন্ডার আইডেন্টিটি, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদি শব্দের মারপ্যাঁচে এদেশে বিকৃত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করছে। ২০২৪ এ ক্লাস সেভেনের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে "শরীফ-শরীফার গল্প" যোগ করা হয় বিকৃতকামীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে ক্বওমে লুত আ.কে নিয়ে বলেছেন,

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ.اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

আর (প্রেরণ করেছি) লূতকে। যখন সে তার কওমকে বলল, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি'? 'তোমরা তো নারীদের ছাড়া পুরুষদের সাথে কামনা পূর্ণ করছ, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কওম'। আর তার কওমের উত্তর কেবল এই ছিল যে, তারা বলল, 'তাদেরকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় তারা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়'। তাই আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। সে ছিল পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম বৃষ্টি। সুতরাং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কিরূপ ছিল।[41]

ক্বওমে লুত সর্ব প্রথম পৃথিবীতে এই বিকৃত যৌনতা সমকামিতার শুরু করে। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালা লুত আ.কে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তারা লুত আ. এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তারা ক

লুত আ. কে অতি পবিত্র থাকতে চায় বলে নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে। যা বর্তমানে বিকৃতকামীরা করে। যারা বিকৃতকামীতার বিরোধীতা করে তাদের বিশুদ্ধতাবাদী বলে আখ্যা দেয়। এবং তাদের সমকামীতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী বলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ক্বওমে লুতকে ধ্বংস করেছেন। তাদের ভয়ংকর আযাব দিয়েছেন। এখনো তাদের আযাবের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মুসলিমদের এমন ভয়ংকর গুনাহের কারণে আল্লাহর আযাবের ভয় করা উচিত। এখনই ক্বওমকে রক্ষা করতে না পারলে অতি শীগ্রই এমন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

[41] সূরা আরাফ, ৮০-৮৪।

বর্তমান প্রজন্ম ফুটবল-ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, নেটফ্লিক্সের মুভি, রিলস, ভিডিও ইত্যাদিতে মগ্ন হয়ে আছে। এই সকল মুভি-ড্রামা, টুর্নামেন্টের মাধ্যমেই প্রতিনিয়ত পশ্চিমা গোষ্ঠী নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। সর্বত্র যৌন বিকৃতিকে স্বাভাবিকিকরণ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। নিজেদের ভঙ্গুর পারিবারিক ব্যবস্থা এখন মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এগুলোকে স্বাধীনতার নামে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আগামী প্রজন্মকে যৌন বিকৃতকামীদের হাত থেকে বাঁচাতে হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সচেতন হতে হবে। মা-বাবাদের সতর্কতার সাথে প্রতি পদক্ষেপ ফেলতে হবে। সন্তান কেমন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে মফস্বলের স্কুল কলেজগুলোতেও সমকামিতার প্রসার হচ্ছে। দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো বিকৃতকামীতার জয়জয়কার। মুসলিম পরিবারগুলোকে রক্ষা করতে, মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ঘরে ঘরে তালিম-দাওয়াতি কাজ এর কোনো বিকল্প নেই। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে সভা সেমিনারের মাধ্যমে বিকৃতকামীদের শব্দের মারপ্যাচে এজেন্ডা বাস্তবায়নের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

মুসলিমদের উচিত নয় শুধু নিজেকে এবং পরিবারকে নিয়েই বিভোর থাকা। খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নিজের পরিবারের ঈমান রক্ষা করতে হলে ক্বওমের ঈমান এবং অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। বিকৃতকামীদের এজেন্ডা নষ্টের ব্যাপারে আলিমদের সাথে পরামর্শের সহিত কাজ করতে হবে। একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোনো কিছুই এই যৌন বিকৃতির ধ্বংস থেকে উম্মাহকে বাঁচাতে পারবে না। বৃহৎ আকারে পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে একমাত্র দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশ, সমাজ এবং উম্মাহকে এই ধ্বংস থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সর্বপরি তাক্বওয়ার সাথে, তাওয়াক্কুল করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে করণীয়

সকল মুসলিমকে ব্যক্তিজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন করতে হবে। ঘুম থেকে উঠা থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ মেনে চলতে হবে। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলামের বিরোধী কিছু এসে গেলে ইসলামকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাহকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ۗ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।[42]

নিয়মিত খুশু-খুজুর সহিত সালাত, সিয়াম পালন, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন অনুধাবন করতে হবে। পারিবারিকভাবে নিয়মিত তালিম করতে হবে। নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যথাযথভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। সম্ভব হলে হজ্জ্ব-উমরাহ পালন করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের ওপর মেহনত করতে হবে। সন্তানদের জন্ম থেকেই ইসলাম অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর চেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে। শিশু অবুঝ অবস্থা থেকেই তাওহীদের শিক্ষা দিতে হবে।

বিনোদন জগৎ নামের অশ্লীলতার নষ্ট জগৎ থেকে সন্তানকে বহুদূরে রাখার চেষ্টা করা। সমাজের অশ্লীলতা, নোংরামিগুলো থেকে সন্তানকে দূরে রাখার চেষ্টা করা। মোবাইল ফোন থেকে নিজে দূরে থাকার চেষ্টা করা এবং সন্তানকেও দূরে রাখা। প্রয়োজন ব্যতিত সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট না করা। পরিবারে উম্মাহ বোধের চর্চা করা। উম্মাহকে নিয়ে ফিকির করা। বিভিন্ন দেশের মাজলুম মুসলিমদের সাহায্য করার চেষ্টা করা। পরিবারে সীরাতের চর্চা করা। নবী-রাসূল-উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের জীবনাদর্শে জীবনকে সাঁজানো।

শত্রু মোকাবিলায় জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প নেই। মুসলিমদের দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার কোনো বিকল্প নেই। একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে পরিবারে বই পড়ার অভ্যাস গড়া। বই পড়ুয়া প্রজন্ম গঠনে মেহনত করা। অধিকাংশ মুসলিমের আজ ফরজ পরিমাণ ইলমও নেই। মুসলিম ছেলে মেয়েরা জানে না কীভাবে ঈদের সালাত আদায় করতে হয়। জানে না গোসল কখন করা ফরজ হয়। জানে না কীভাবে মাইয়্যেতের গোসল দিতে হয়। কেউ কেউ সালাত কীভাবে আদায় করে তাও জানে না। নিরানব্বই ভাগ মুসলিম পারে না সহীহভাবে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে। যা একজন মুসলিম হিসেবে চরম লজ্জাজনক।

---

[42] সূরা আহযাব, ২১।

তাই স্বল্প সংখ্যক যারা ইসলামকে ধারণ করে তাদের উচিত ব্যাপকভাবে দাওয়াতি কাজ করা। দ্বীনের ফরজিয়াত শিক্ষা দেওয়া। ব্যাপকভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর মেহনত করা। ভবিষ্যতের চিন্তায় অর্থ জমা না করে দ্বীনের খেদমতে ব্যয় করা। ভবিষ্যৎ নিয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা। দুনিয়ার পেছনে ছুটে কাড়ি কাড়ি অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স জমা করে একদিন হটাৎ চলে যাওয়ার কি ফায়দা?

সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-স্বজন প্রত্যেকে দুনিয়ায় নিজের রিজিক নিয়ে এসেছে। তাদের জন্য জীবনভর শুধু অর্থ উপার্জন করে যাওয়া ব্যক্তি দুনিয়া আখিরাত দুদিকেই লোকসান করে। প্রয়োজন মিটে যাওয়া পরিমাণ অর্থে সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং সেই পরিমাণ সময়ই অর্থ উপার্জনের পেছনে দেওয়া উচিত। স্ত্রী-পরিবার, পরিজনের প্রয়োজন মিটিয়ে স্বল্প সঞ্চয় করে বাকি অর্থ এবং সময় দ্বীনের খেদমতে দেওয়া উচিত। নয়তো পশ্চিমা শত্রুদের ছড়ানো বিকৃত মতবাদে আপনারই সন্তান ঈমান হারা হতে পারে। তখন দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হবে।

বিয়ে-শাদীতে যৌতুক, গায়ে-হলুদ ইত্যাদি বিধর্মী সংস্কৃতি ত্যাগ করা। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কালচার যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তা বর্জন করা। এদেশে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন যৌতুকের প্রচলন আছে। মুসলিমদের মাঝে এগুলো বর্জনের দাওয়াহ দেওয়া। যে কোনো প্রকার বিদয়াতকে ত্যাগ করা। সকল কুসংস্কার বর্জন করা।

উত্তম মানুষের সোহবতে থাকা। পরিবেশ মানুষের ওপর বিস্তর প্রভাব রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আগে পূর্ণ পর্দানশীন মেয়েটাকে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের কারণেশেষ সেমিস্টারে ওড়না ছাড়া ঘুরতে। কঠোরভাবে যুহদ অবলম্বন করা ছেলেটাকে দেখা যায় মেয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে। পরিবেশ-সঙ্গ মানুষের ওপর ঠিক এতটাই প্রভাব রাখে। তাই মুসলিমদের উচিত হক্কপন্থি আলিম-উলামা ও মুত্তাকীদের সোহবতে থাকা। মাসে কিছুদিন আলিমদের তালিমে বসে আত্মশুদ্ধির পেছনে সময় দেওয়া। বেদ্বীন সঙ্গ ত্যাগ করা। দাওয়াতি কাজ ব্যাতিত বেদ্বীনদের সাথে দুরত্ব বজায় রাখা। বেদ্বীনদের সংস্পর্শে ঈমানের ক্ষতি হচ্ছে কীনা, তাদের থেকে বদগুণাগুণ তার কাছে স্থানান্তরিত হচ্ছে কীনা সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা।

দ্বীন পালনে পরিবার-আত্মীয়স্বজন থেকে বাঁধা আসলে সবর করা এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে লেগে থাকা। মনে রাখা এই সকল কষ্ট যন্ত্রণার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তায়ালা দুনিয়া আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিবেন। কষ্ট যন্ত্রণা আসা সৎ পথে থাকার লক্ষণ। অতিরিক্ত প্রশংসা, ভালোবাসা মিললে ধরে নিতে হবে বিচ্যুতির পথে আছে। দ্বীনের পথে বাঁধা আসবে, বিপত্তি আসবে এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম।

সবক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করা। তাক্বওয়া অবলম্বন করা। রুখসাত অবলম্বন না করে আজিমাত অনলম্বনের চেষ্টা করা। একদমই অপচয় না করা। যা না হলেই না শুধু তাই করা। মানুষের খুশির আগে আল্লাহর খুশিকে প্রাধান্য দেওয়া। মা-বাবা ও উস্তাদদের খেদমত করা। তাদের দুয়া নেওয়া। তাদের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। ভাই-বোনের সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করা। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ভাব রাখা। প্রতিবেশীর হক্কের ব্যাওয়ারে সচেষ্ট থাকা। সর্বদা ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকা। ঘুম থেকে ওঠা, ঘুমাতে যাওয়া, ঘরে প্রবেশ, ঘর থেকে বের হওয়া, খাবার খাওয়ার শুরু-শেষ, পোশাক পরা, টয়লেটে প্রবেশ-বের হওয়া ইত্যাদি দৈনন্দিন সকল মাসনুন দুয়াগুলো নিয়মিত পড়া। পরিবারে দুয়া পড়ার চর্চা রাখা। সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমল বাধ্যতামূলকচাবে করা।

সবসময় গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা। সর্বক্ষণ নজ্বরের হেফাজত করা। ভুলবশত একবার নজ্বর বিক্ষিপ্ত হলেই দ্রুত তাওবা করা, অনবরত ইস্তিগফার করা। সবসময় অজু অবস্থায় থাকা। জিক্বিররত থাকা। আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহর স্মরণে বাঁধা দেয় এমন কিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখা। সময় অপচয় না করা। সময়ের কাজ সময়ে করা। সবসময় ইসলামি লিবাস ধারণ করা। কাফিরদের থেকে দূরে থাকা। কাফিরদের সংস্কৃতির প্রতি অন্তরে ঘৃণা লালন করা। কোনোভাবেই যেন অন্তরে তাদের সংস্কৃতির প্রতি ভালো লাগা তৈরি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ .

'আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইয়াহূদীগণ আঙ্গুলের ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়।[43]

[43] জামে আত তিরমিজি, ২৬৯৫।

বর্তমান মুসলিমদের পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার একটা বিশেষ কারণ হলো মুসলিমদের দলে দলে পশ্চিমা দেশে বসবাস করা। অসংখ্য মুসলিম পশ্চিমাদের বিলাসবহুল জীবনের মোহে কাফিরদেশগুলোতে পাড়ি দেয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে। মুসলিমদের মনে রাখা উচিত এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং পরীক্ষাক্ষেত্র। আমাদের আসল আবাসস্থল আখিরাত, হয় জান্নাত নয়তো জাহান্নাম। আখিরাতে জান্নাত পেতে হলে দুনিয়াতে কষ্ট করতে হবে এটাই বাস্তবতা। দুনিয়া তো মু'মীনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দুনিয়া মু’মিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য।[44]

জ্ঞান অর্জন ও দাওয়াতি কাজ ব্যাতিত কোনো মুসলিমের উচিত নয় কাফির দেশগুলোতে সফর করা এবং স্থায়ী হওয়া। কেননা পরিবেশ মানুষকে বদলে দেয়। পশ্চিমের অবাধ স্বাধীনতা, অবাধ যৌনতা, চারদিকে লাগামহীন জীবন দেখে মুসলিমরাও সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

আমি ঐ মুসলিম থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।[45]

এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে উলামায়ের কেরাম ফতোয়া দিয়েছে অমুসলিম প্রধান দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা জায়েজ নয়। পড়াশোনা এবং দাওয়াতি কাজ ব্যাতিত অন্য উদ্দেশ্যে যাওয়া উচিত নয়।

[44] সহীহ মুসলিম,৭৩০৭।

[45] সুনানে আবু দাউদ, ২৬৪৫।

উপসংহার

একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোনো কিছুই মানবজাতির সমস্যাগুলোর জন্য সমাধান দেয় না। একমাত্র ইসলামেই সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেওয়া জীবন বিধান মেনে চললেই মুসলিমরা তাদের পরিবার এবং সমাজকে পশ্চিমা শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করপ্তে পারবে। জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ বাস্তবায়নেই মুসলিমদের মুক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাতের নিয়মিত চর্চা, সন্তানদের রাসূলুল্লাহ ﷺ, নবী আলাইহিমুস সালাম, উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও সাহাবা রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের মতো গড়ে তোলার চেষ্টা করা। দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া।

আলহামদুলিল্লাহ এই রিসার্চ পেপারটি আমরা সম্পন্ন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ রহমাহতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাজটিকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন, আমীন। এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর তাওফিক দিন, আমীন। এই রিসার্চে আমি বিভিন্ন বই, আর্টিকেল এবং লেকচারের সহায়তা নিয়েছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই সকল লেখকদের প্রতি।

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০, বিবাহ পাঠ ইত্যাদি বই; আসলাফ একাডেমির ম্যারেজ প্রিপারেশন কোর্স, ম্যাগাজিন মাসিক আত তাহরীক ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। এগুলোর লেখক এবং প্রকাশকদের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। সর্বপরি আল্লাহ রব্বুল ইযযাত ওয়াল জালালের শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এই রিসার্চ পেপারটি সম্পন্ন করার সক্ষমতা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন।